সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ইসলামী জাগরণের রূপরেখা

[পর্যালোচনা ও সুচিন্তিত মতামত]

অনুবাদ ও গ্রন্থনা

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

আরেফবিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ও
শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর সংশ্রবপ্রাপ্ত

বাইতুল কিতাব

১৮/১৩, ব্লক–এইচ, মিরপুর–১, ঢাকা-১২১৬

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

- মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি‘আ বিন্নূরিয়া আল-ইসলামিয়া, ঢাকা
- ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিকাহ একাডেমী
- অধ্যাপক, ইসলামী অর্থনীতি, ফিকাহ একাডেমী টাঙ্গাইল
- ধর্মীয় উপদেষ্টা, হিউমান রাইট্‌স ডিফেন্ডার বাংলাদেশ
- সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন ইনস্টিটিউট, ঢাকা

www.muftikabirahmadashrafi.weebly.com

প্রকাশনায়: **বাইতুল কিতাব**

১৮/১৩, ব্লক–এইচ, মিরপুর–১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল ঃ ০১৫১১ ৯৪২৯৬৫, ০১৭১৪ ৩২৩২৯৬

প্রথম প্রকাশ (একত্রে) : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিনিময় : ১২০.০০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়

দারুল হাদীস	**মাকতাবাতুয যাকারিয়া**
দোকান নং- ২৪, ইসলামী টাওয়ার	বাসা- ৩২, ব্লক- ডি
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭৩০ ৯৯৫৭৭২	মোবাইল : ০১৭১২ ৯৫৯৫৪১

শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ. এর

জীবন্ত বাণী

মাল্টার জেলে দুটি শিক্ষা লাভ

“আমি মাল্টার জেলে নির্জনতায় ভেবে দেখেছি, মুসলমান গোটা বিশ্বে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে দুটি কারণে মার খাচ্ছে। এক, কুরআন ছেড়ে দেয়া এবং দুই, আপসের মতানৈক্য ও গৃহযুদ্ধ। তাই আমি জেল থেকেই দৃঢ় সংকল্প করে এসেছি, বাকি জীবন কুরআনে কারীমকে শব্দগত ও অর্থগতভাবে প্রচার-প্রসারে অতিবাহিত করবো। ছোটদেরকে শাব্দিকভাবে কুরআন শিক্ষাদানের লক্ষ্যে গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লায় নূরানী মক্তব কায়েম করবো। আর বড়দেরকে কুরআনের দরস ও তাফসীরের মাধ্যমে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝাবো এবং কুরআনের উপর আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেবা। আর মুসলমানদের আপসের যুদ্ধ ও মতানৈক্য কোনোভাবেই সহ্য করবো না।”

(ওয়াহদাতে উম্মত;
মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., পৃ. ৪৯)

লেখকের কয়েকটি সংকলন ও অনুবাদকর্ম

১. হিসনুদ দু'আ [সংকলন/প্রকাশিতব্য]
(জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের মাসনূন দু'আসমগ্র)

২. হিসনুল অযাইফ [সংকলন ও অনুবাদ আরবী থেকে/প্রকাশিত]
(কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্ভরযোগ্য দৈনন্দিনের অযীফা)

৩. অল্প আমল অধিক সাওয়াব [সংকলন/প্রকাশিত]
(অল্প সময়ে অধিক সাওয়াব লাভের কতিপয় সহজ আমল)

৪. কুরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে পড়ুন [সংকলন/প্রকাশিত]
(তাজবীদের নিয়মাবলী সহজ ও সাবলীল ভাষায় সংকলিত)

৫. কুরআন মাজীদ বুঝে পড়ুন [সংকলন/প্রকাশিতব্য]
(কুরআন বুঝার জন্য আরবী ভাষার মৌলিক বিষয়াদি)

৬. হিকায়েতে লতীফ [অনুবাদ ফার্সি থেকে/প্রকাশিত]
(জ্ঞান বৃদ্ধিকারী ঘটনাসমূহ)

৭. মাসায়েলে মাসাজিদ ও ঈদগাহ [অনুবাদ উর্দূ থেকে/প্রকাশিত]
(মসজিদ ও ঈদগাহ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল)
মূলঃ মাওলানা রফআত কাসেমী

৮. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি [অনুবাদ উর্দূ থেকে/প্রকাশিতব্য]
(ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতির স্ববিস্তার ও তুলনামূলক পর্যালোচনা)
মূলঃ মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

৯. একজন মুসলমান কিভাবে জীবন যাপন করবে? [অনুবাদ উর্দূ থেকে/প্রকাশিত]
(মুসলমানদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নসীহত)
মূলঃ মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী রহ.

১০. ইসলামী জাগরণের রূপরেখা [অনুবাদ উর্দূ থেকে/প্রকাশিত]
(দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা)
মূলঃ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

(১)

ইসলামী জাগরণের রূপরেখা

মুসলিমরাষ্ট্রে ইসলামী জাগরণের রূপরেখা

অমুসলিমরাষ্ট্রে ইসলামী জাগরণের রূপরেখা

❑ ❑ ❑

(২)

পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বিষয় *পৃষ্ঠা*

❑ ❑ ❑

(৩)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয়

ছয়টি উপদেশ

(৪)

আরববিশ্ব পশ্চিমাবিশ্বের টার্গেট কেন?

(৫)

আরব জাতীয়তাবাদ
আরববিশ্বের জন্য মারাত্মক শঙ্কা

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুবাদকের কথা

ইসলামই একমাত্র শাশ্বত দ্বীন

"আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"[১] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।"[২] ইসলাম আবির্ভাবের মাধ্যমে হযরত মূসা আ. ও হযরত ঈসা আ. এর শরীআতসহ পূর্ববর্তী সকল শরীআত রহিত (Discontinue) হয়ে গেছে। সেসব শরীআত ছিল সাময়িক ও সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ শুধু স্ব স্ব যুগ এবং স্ব স্ব জাতির জন্যে প্রযোজ্য ছিল। পক্ষান্তরে ইসলাম বিশেষ কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর জন্যে নয়। বরং সকল মানবজাতি ও গোটা বিশ্বের জন্যে।

যেহেতু পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ রহিত বা পরিবর্তিত। সুতরাং এখন আর তা বিধানাকারে গ্রহণ করা চলবে না। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ তা গ্রহণ করে আর ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তাহলে এটা হবে মারাত্মক পথভ্রষ্টতা ও বড় ধরণের বোকামি। কিন্তু এ কাজটি ইহুদী-খ্রিস্টানরা করেছে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ রহিত, পরিবর্তিত ও বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা তা বিধান ও পালনীয় বলে দাবি করছে। কুরআন অবতীর্ণের পর তারা তা মেনে নেয়নি। বরং রীতিমতো শত্রুতায় নেমেছে। ইহুদী-খ্রিস্টানদের পরিভাষায় তাওরাতকে পুরাতন নিয়ম (The Old Testament) এবং ইনজিলকে নতুন নিয়ম (The New Testament) বলা হয়। তাদের পরিভাষায় বলি, তাওরাত যদি হয় পুরাতন নিয়ম আর ইনজিল হয় নতুন নিয়ম তাহলে কুরআন মাজীদ হচ্ছে সর্বশেষ নিয়ম (The Last Testament)। এরপর আর কোনো ঐশী বাণী আসবে না। তাই তাদের একান্ত উচিত পুরাতন ও নতুন নিয়ম ছেড়ে সর্বশেষ নিয়ম মেনে নেয়া।

ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদী-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র

ইহুদী-খ্রিস্টানরা শুরু থেকেই ইসলাম ও মুসলমান এবং কুরআন-হাদীস ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তারা যুগে যুগে

১. সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯
২. সূরা আলে ইমরান, ৩: ৮৫

মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন ষড়যন্ত্র এঁটে আসছে। তবে গত কয়েক শতাব্দী ধরে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন করেছে। তারা নতুন বোতলে পুরাতন মদ পরিবেশন করছে। অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের আড়ালে জোঁকের ন্যায় তাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে। মুসলমানদেরকে পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়াই তাদের মূল পরিকল্পনা।

পশ্চিমাবিশ্ব মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে সহায়তার নামে অভিশপ্ত ও চড়াহারের সুদি ঋণের বোঝা। আধুনিকতার নামে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির সয়লাব ঘটিয়েছে। এর ফলে সাধারণ মুসলমানদের তো কথাই নেই এমনকি শিক্ষিত শ্রেণীও তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার। মুসলমানদের বর্তমান শিক্ষিত শ্রেণীও জানে না ইসলামের প্রকৃত শত্রু কারা। তাই তারা ইসলামের শত্রুকে মিত্র ভেবে তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে যাচ্ছে। আর ভুল বোঝাবোঝির কারণে মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুসুলভ আচরণ করছে। ইসলামের স্বর্ণযুগ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি অনাস্থার মনোভাব প্রতীয়মান। এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে, মুসলমানদেরকে বিশেষ করে উলামাসমাজকে ইসলামের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হতে হবে। ইসলামের প্রকৃত শত্রু এবং শত্রুর মিত্রদেরকে চিনতে হবে। তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে ও চিহ্নিত করতে হবে। যুগ অনুপাতে তা বুদ্ধিমত্তা, হিকমত, পরিকল্পনা ও ঐক্যমতের সাথে প্রতিহত ও মোকাবিলা করতে হবে। তবেই ইসলাম ও মুসলমানরা তাদের পূর্বশক্তি ফিরে পাবে।

মুসলমানরাই বিজয়ী হবে

মুসলমানরা যদি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্মে (আমলে সালেহ'র মধ্যে) লেগে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তাদেরকে বিশ্বের নেতৃত্ব (খিলাফত) প্রদান করা হবে। শুধু মানুষ কেন পশু-পাখিও তাদের অনুগত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন।"[১] দৃঢ়বিশ্বাস তথা

---

১. সূরা নূর, ২৪: ৫৫

ঈমানের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন, "তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"[১]

উক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মুসলমানরা যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে চায়। পৃথিবীতে সম্মান ও শাসনকর্তৃত্ব চায় তাহলে তাদেরকে দৃঢ়বিশ্বাস (মজবুত ঈমান) ও সৎকর্ম (আমলে সালেহ) আঁকড়ে ধরতে হবে। আর আপসের মতানৈক্য পরিহার করতে হবে।[২]

যদি মুসলমানদের মধ্যে (১) মজবুত ঈমান (২) আমলে সালেহ এবং (৩) মতৈক্য এ তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে তারা এ ধরায় উন্নত শির নিয়ে বীরের মতো জীবন যাপন করতে পারবে। আর আখেরাতের সফলতা ও অফুরন্ত পুরস্কার তো আছেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় হতভাগা রুগি (মুসলমান) আর কে হতে পারে, যার কাছে ওষুধ (কুরআন) থাকা সত্ত্বেও সেবন (আমল) না করে কষ্টে (অপমানে) কাতরায় আর বলে, আমি তো মুসলমান তবুও আমার এত বিপদ (অপমান ও অপদস্থতা) কেন!

ইসলামের সোনালী যুগে গোটা বিশ্বে আরববিশ্বই নেতৃত্ব দিয়েছিল। বর্তমান আধুনিক ও নামমাত্র সভ্য সংস্কৃতির অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বকে, বিশেষ করে মুসলিমবিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার কথা ছিল আরববিশ্বের। কিন্তু 'যাকে দিয়ে ভূত তাড়াবো, তাকেই ধরেছে ভূতে' প্রবাদটি কয়েক যুগ ধরে তাদের ক্ষেত্রে তিলে তিলে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ যাদেরকে দিয়ে আমেরিকা ও ইসরাইল ঠেকাবো তারা এখন আমেরিকার মিত্র। আমেরিকার (যার মূলে রয়েছে ইসরাইলি নীতিমালা) সলাহ-পরামর্শ মতে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। আরববিশ্ব (আমেরিকা নামক) বিড়ালকে দুধ (ফিলিস্তীন) পাহারায় নিযুক্ত করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এতটুকুই নয় বরং ঘুমের কাঁধে চড়ে আমেরিকা ও ইসরাইলের কালো থাবা থেকে নিরাপদ থাকার স্বপ্নও দেখছে। এরূপ অনুভূতি কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں

সে এখনও স্বপ্নে বিভোর, যে স্বপ্নের মধ্যে জাগ্রত!

---

১. সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৩৯
২. সূরা আলে ইমরান, ৩: ১০৩

আরবদের মধ্যে দাওয়াতি সংগঠনের প্রয়োজন

আরবদেরকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে কোনো শক্তিশালী দাওয়াতি সংগঠন থাকা প্রয়োজন। আরববিশ্বে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনে'র নিষিদ্ধকরণ এবং হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব প্রমুখের শহীদ হওয়ার পর সেখানকার উলামাসমাজ আত্মরক্ষার্থে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে, আরবদেরকে ইসলামের প্রতি আস্থাশীল করা এবং মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্ব দানের জন্যে প্রস্তুত করা। যদি তারা ইসলামের প্রতি আস্থাশীল হয়ে মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং মুসলিমবিশ্বের মধ্যে পুনর্জাগরণের বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবেই ইসলাম আবারও নিজের শক্তি ফিরে পাবে। আর মুসলমান ফিরে পাবে তার হারানো সম্মান।

মুসলিম দেশগুলোর করণীয়

১) 'মুসলিম জাতিসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করা

মুসলিম দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ও স্বার্থ রক্ষার জন্যে মুসলিম জাতিসঙ্ঘ (MUN- Muslim United Nations) প্রতিষ্ঠা করা উচিত। যা হবে অধিক সক্রিয় ও শক্তিশালী। ও.আই.সি দ্বারা এ কাজ উদ্ধার হবে না। এ সংগঠন একটি জীবিত লাশে পরিণত হয়েছে, যার ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে নেই কোনো কার্যকরী ভূমিকা। সৌদি আরব এ সংগঠনের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ নেতৃত্ব দানে এবং মুসলিমভ্রাতৃত্বের আদলে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ। অথচ ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর মোকাবিলা করার জন্যে মুসলিম দেশগুলোর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

২) 'গোল্ড দীনার' প্রচলিত করা

মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডলার-ইউরোর পরিবর্তে গোল্ড দীনার (Gold Dinar) প্রতিষ্ঠা ও প্রচলিত করা উচিত। এ মূদ্রা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং লেনদেনের নিরাপত্তাসহ আন্তর্জাতিক মুসলিমভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করবে।

৩) 'মক্কামান টাইম' প্রতিষ্ঠা করা

মুসলিম অধিকার ও আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে গ্রীনিচমান টাইমের পরিবর্তে মক্কামান টাইম প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করা উচিত। যেহেতু মক্কা পৃথিবীর মধ্যখানে অবস্থিত, তাই মক্কাকে কেন্দ্র করেই টাইম স্টান্ডার্ড হওয়া উচিত। এটা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়

বিজ্ঞান (Science), প্রযুক্তি (Technology) এবং শিল্পের (Industry) ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত বৈজ্ঞানিক (Scientific) ও শৈল্পিক (Industrial) সফলতা অপর মুসলমান ভাইয়ের হাতে তুলে দেয়াই ঈমানের দাবি। এক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক যেসব সেবাদানে (তেল-গ্যাস উত্তোলন ইত্যাদির ক্ষেত্রে) মুসলমান দেশগুলো সক্ষম তা অমুসলিমদের থেকে গ্রহণ করা অনাকাঙ্ক্ষিত।

৫) যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধাস্ত্র বিনিময়

মুসলিম ব্লকের আত্মরক্ষার তাকিদে আপসে সামরিক সাহায্য-সহযোগিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহ এক দেহের ন্যায়। তাই একজন মুসলমানের শত্রু বস্তুত সকল মুসলমানের শত্রু। সুতরাং মুসলিম দেশগুলোর আপসে যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধের আধুনিক অস্ত্র-সরঞ্জাম এবং মুসলিম সেনাদের ট্রেনিং বিনিময় করা উচিত। এ দ্বারা মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা বীরের মতো জালিমদের মুকাবিলা করতে পারবে।

৬) ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা বিনিময়

যুবকরাই যেকোনো জাতির মূল সম্পদ। তারাই পারে কোনো জাতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে। তাই প্রত্যেক মুসলিম যুবককে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দীক্ষায় দীক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে খ্যাতিসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেধা তালিকার ভিত্তিতে সমানভাবে অধ্যয়নের সুযোগ করে দেয়া উচিত। বিশেষ করে হিন্দুস্তানের দারুল উলূম দেওবন্দ, মিসরের জামি'আ আযহার এবং সৌদি আরবের মদীনা ভার্সিটিতে ভর্তি ও অধ্যয়নের বিষয়টি সহজসাধ্য করা উচিত। এ মহান উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের ভিসা নীতিমালা শিথিল হওয়া দরকার।

৭) জাতীয়তাবাদী মতবাদ পরিহার

জাতীয়তাবাদী মতবাদ একটি অনৈসলামী এবং ইসলামী চেতনা বিরোধী মতবাদ, যার মূলে রয়েছে কিবর ও শিরকের মতো যঘণ্য পাপের অভিপ্রায়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, “তাকওয়া ব্যতীত কোনো আরব অনারবের চেয়ে, কোনো অনারব আরবের চেয়ে, কোনো শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ’র চেয়ে, কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ’র চেয়ে উত্তম নয়।” আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, “নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যার তাকওয়া সর্বাধিক।”[১]

কুরআন-হাদীসে যেসব স্থানে মুসলিম কওম বা জাতির কথা বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে সমগ্র মুসলমান। বর্ণ, ভাষা বা সীমানা কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।[২] জাতীয়তাবাদী মতবাদ অনৈসলামী হওয়া সত্ত্বেও আরবগণ এরূপ ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সর্বশেষ খিলাফতব্যবস্থা ‘উসমানী খিলাফতে’র সাথে বিদ্রোহ করে। মক্কার গভর্নর শরীফ হোসন উসমানী খিলাফতের সর্বপ্রথম গাদ্দার ও বিদ্রোহকারী। এমনকি তিনিই হিন্দুস্তানে খিলাফত আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ.কে মক্কা থেকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেন।

“আমরা আরব। আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতীর চেয়ে উত্তম। আমরা কেন অনারব জাতী দ্বারা শাসিত হব?” এরূপ জাতীয়তাবাদী শ্লোগান দিয়ে হিজাজে মুকাদ্দাস খিলাফতে উসমানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভক্তির শিকার হয়েছে। ফলে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট আরব দেশ অস্তিত্ব লাভ করে। আরবরা মুসলমানদের তৎকালীন মহাশত্রু ব্রিটিশের সহযোগিতায় খিলাফতে উসমানী ভঙ্গ করেছে। এর ফলে তারা নামমাত্র স্বাধীনতা লাভ করলেও মুসলমানদের পৈত্রিক ভূমি এবং ধার্মিক মহানুভূতির কেন্দ্রস্থল ফিলিস্তীন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তাদের এ পাপের কারণে

---

১. সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১৩

২. ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীতে সব জাতীয়তাই বর্জনীয়। ...... বিদায় হজ্বের সফরে রসূলুল্লাহ স. একটি কাফেলার সাক্ষাত পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কোন জাতীয় লোক? উত্তর হলো: نحن قوم مسلمون - আমরা মুসলমান জাতি (সহীহ বুখারী)। এতে ঐ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। (মাআরেফুল কুরআন সংক্ষিপ্ত, পৃ. ৩৯২)

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পূত-পবিত্র এই স্থানে ইতিহাসের যঘণ্য ও পাপিষ্ঠ ইহুদী জাতি একত্রিত হয়ে ব্রিটিশের সহযোগিতায় জাতীয়তাবাদী ইহুদীরাষ্ট্র 'ইসরাইল' প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে তারা প্রতিনিয়ত ফিলিস্তীনি আরবদের বসতবাড়ি গুড়িয়ে দিয়ে ইসরাইলের সীমানা সম্প্রসারণ করে যাচ্ছে। এটা মূলত ইহুদীদের বিশ্বব্যাপী নীলনকশা বাস্তবায়নের অংশবিশেষ।

মোদ্দাকথা, জাতীয়তাবাদ একটি অনৈসলামী মতবাদ। বিশেষ করে আরব জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক মুসলিমভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বড় ধরণের অন্তরায়। সুতরাং বিশ্বব্যাপী ইহুদীবাদ ও খ্রিস্টবাদের মোকাবিলা করতে বিশ্বব্যাপী মুসলিমভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

ইসলামী জাগরণ ও ইহুদীবাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন

বক্ষমান কিতাবটি আলী মিয়া নদভী রহ. এর ইসলামী জাগরণ এবং চিন্তা-চেতনায় ইসলাম সম্পর্কিত কয়েকটি পুস্তিকার সরল অনুবাদ, যা পাঠ করে ইসলামের প্রকৃত শত্রু ও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে মাত্র। তবে ইসলামের আসল শত্রু কারা? ইসলামের অস্তিত্বকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্যে হুমকি মনে করে কারা? ইসলামের পুনর্জাগরণের পথে বাধা প্রদানকারী ও ষড়যন্ত্রকারী কারা? এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইহুদীদের গোপন নথিপত্র 'ইহুদী প্রোটোকোল', মুফতী আবু লুবাবা শাহ মানসূর দা. বা. সংকলিত 'দাজ্জাল' এবং যায়েদ হামিদ রচিত 'অর্থসন্ত্রাস' (معاشی دہشت گردی) অধ্যয়ন করুন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয় কী? ইসলামী পুনর্জাগরণের রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' ও 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' এবং আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী রচিত 'ইসলামী পুনর্জাগরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা' অবশ্যই পড়ুন। আল্লাহ তা'আলা ইসলামী পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে বক্ষমান কিতাবটি একটি মাইল ফলক হিসেবে কবুল করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

কবির আহমাদ আশরাফী

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

kabir323@gmail.com

প্রসঙ্গ কথা

মাও. মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
وعلى اله واصحابه اجمعين، أما بعد:

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (Cultural Centre) এর শানদার হলরুমে ২০ই রবিউল আওয়াল ১৪০৯ হি. মোতাবেক ২৯ই নভেম্বর ১৯৮৮ রোজ মঙ্গলবার বিকালে 'ইসলামী জাগরণের রূপরেখা' শিরোনামে একটি বক্তৃতা পেশ করেন। বিশাল হলরুমটি শ্রোতায় ছিল কোনায় কোনায় ভর্তি। সেখানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহীদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি ছিল।[১] বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্মানিত বক্তা নিজেই চয়ন করেছিলেন, যা বর্তমান সময়ের প্রয়োজন ও যুগোপযোগী। বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী জাগরণের প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং মুসলিম জনতা এসব আন্দোলন সম্পর্কে বড়ই আশান্বিত। ইতিহাসের গভীর পর্যালোচনা ও উদ্দেশ্যপূর্ণ অধ্যয়নের বহুবিধ প্রয়োজন রয়েছে। তেমনিভাবে প্রয়োজন রয়েছে দাওয়াতের পুরনো ও নতুন সংগঠনগুলোর কাল-পাত্র এবং জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যালোচনা করা। প্রভাব বিস্তারকারী সমসাময়িক চিন্তাধারা ও মুসলিম উম্মাহর অগ্রযাত্রার বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা। বর্তমান যুগে ইসলামী জাগরণের পর্যালোচনা করা ও স্বার্থহীন পরামর্শ পেশ করা।

সম্মানিত আলোচক প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ধর্মীয়, দাওয়াতি ও সংস্কারমূলক আন্দোলনসমূহ অধ্যয়ন করে আসছেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য সংগঠন অতি নিকট থেকে দেখেছেন ও যাচাই করেছেন।

---

১. এ সফরে হযরতের সংশ্রব লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল অধমের। সুতরাং যা কিছু লিখছি তা স্বচক্ষে দেখা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'আল-ইত্তিহাদে'র প্রতিবেদনও আমার বর্ণিত তথ্যের সমর্থন করে।

কতক সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে স্বার্থহীন গভীর সম্পর্কও ছিল। তিনি এসব সংগঠনের কার্যক্রমের প্রসংশা করেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন। আবার কখনও এমন পরামর্শ দিয়েছেন, যা দ্বারা তাদের কোনো ভুল সংশোধন হয়েছে; কিংবা তাদের কার্যক্রমের শক্তি ও প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে; অথবা যেসব বিষয়ের প্রতি তিনি নেতা-কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন মনে করেছেন। এসব পরামর্শ প্রায়শই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হয়।

এই তাৎক্ষণিক ভাষণে (যা পরে টেপরেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সম্মানিত বক্তা এতে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন) ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত মতামত ও পরামর্শের সারসংক্ষেপ আলোচিত হয়েছে, যা ইসলামী জাগরণের মহান উদ্দেশ্যের (যা একটি বড় দায়িত্ব ও আমানত) অগ্রদূত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের সংগঠনের জন্যে উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামী জাগরণমুখী আন্দোলনের সঠিক দিক নির্ণয় এবং দ্বীনী সংস্কারের প্রচেষ্টাকে আরও বেশি ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে এ দ্বারা সহায়তা পাওয়া যাবে। মুসলিম উম্মাহকে (বিশেষ করে ইসলামীবিশ্ব, যেখানে পুনর্জাগরণের আন্দোলন বেশি সোচ্চার) ইসলামী জীবনের বাস্তবচিত্র, ইসলামের বার্তা ও তার গুরুত্ব অনুধাবন করানো সম্ভব হবে।

বক্তব্যটি আরবীতে ছিল, যা পুস্তিকা আকারে 'দারে আরাফাত, ইউপি' থেকে প্রকাশিত হয়। এর উর্দু অনুবাদ করেছেন নদওয়াতুল উলামার উস্তাদ মাওলানা নূর আযীম নদভী এবং প্রকাশ করার সৌভাগ্য হচ্ছে 'মুসলিম ইন্টেলিকচুয়াল ফোরাম, লাখনৌ'র। এটি মুহতারাম আলোচকের তত্ত্বাবধায়নে মুসলমানদের মধ্যে সঠিক দ্বীনী, ইলমী ও চলমান যুগের জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মহান উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বক্ষমান পুস্তিকাটি মাইল ফলক প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা হযরতের কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করছি যে, তিনি ফোরামের পক্ষ থেকে এটি প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেছেন।

মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী
প্রধান, আরবী ও সাহিত্য বিভাগ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ
১৫ রজব ১৪০৯ হি./২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ ঈ.

আমি খুবই গর্বিত ও আনন্দিত যে, এই গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে 'ইসলামী জাগরণ'র বিষয়ে আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা উলামায়ে কেরাম ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সমকালীন সময়ে তারা এ বিষয়ে গবেষণা করছেন এবং বিষয়টির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে নিজেদের মতামত পেশ করছেন। বিষয়টি স্পর্শকাতরও (Sensitive) বটে। কারণ ইসলামী জাগরণের আকাঙ্ক্ষা বহুলোকের মনে-প্রাণে পবিত্র বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে। যেকোনো দেশে ইসলামী জাগরণের কথা শোনলেই তারা আশান্বিত হন এবং সে জাগরণের প্রতি ভালো কিছু আশা রাখেন। কিন্তু আমি এ মজলিসে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট ভাষায় কিছু কথা বলতে চাই। ইসলামীবিশ্বে ইসলামী জাগরণ সম্পর্কে গঠনমূলক পর্যালোচনা করতে চাই। আমি মনে করি সমকালীন সময়ে এর প্রয়োজন রয়েছে।

মহান আমানত

ইসলামী জাগরণ একটি বড় ধরণের দায়িত্ব ও মহান আমানত, যার তুলনা একটি তীরের সাথে করা যায়। তীর টার্গেটে পৌঁছার পরিবর্তে যদি ভুল জায়গায় লাগে তাহলে এটা ধনুকের দোষ নয়। এটাকে ঘটনাচক্রও বলা হবে না। বরং এটা তীরন্দাযের দোষ ধরা হবে যে, তার দুর্বল হাত ও তীর নিক্ষেপের ব্যর্থতার কারণেই টার্গেট মিস হয়েছে। ইসলামী জাগরণের বিষয়টি উল্লেখিত উপমার মতোই। যদি এ জাগরণ সঠিক পদ্ধতি ও সুনির্দিষ্ট পন্থায় না হয় আর এতে সামান্যতম ত্রুটি থেকে যায় তাহলে এটা ইসলামের শ্বাশত শক্তি ও যোগ্যতার উপর আঘাত হানবে। তখন এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকবে না যে, একমাত্র ইসলামের মধ্যেই বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী জাগরণের যোগ্যতা রয়েছে। ইসলামই নষ্ট পরিবেশের মোকাবিলা করে একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়তে পারে। একটি সুষ্ঠু নেতৃত্ব দিতে

পারে। বরং সেক্ষেত্রে এ আশঙ্কাও রয়েছে যে, এ জাগরণ সঠিক পন্থা ও সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে না হলে এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। আর অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী জাগরণের সকল প্রচেষ্টা ও সফলতার সমূহ সম্ভাবনাকে সন্দেহের চোখে দেখা হবে।

কিছু লোক ইসলামী জাগরণ বলতে একটি নির্দিষ্ট ধ্যান-ধারণা ও ব্যাখ্যা বুঝে থাকে। তারা এ জাগরণের অর্থ পথভ্রষ্ট ও নষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ এবং অনৈসলামী সরকার ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মনে করে। তারা যেকোনো ধরণের অনৈসলামী নেতৃত্ব ও উপনিবেশবাদী শক্তি বিরোধী আন্দোলনকে আবেগপূর্ণ হয়ে স্বাগত জানায়। এমনকি তারা এসব সংগঠনের খোকসা শ্লোগান ও বিক্ষোভ ইত্যাদিরও জোরালো সমর্থন জানায় এবং এসব শ্লোগান, বিক্ষোভ-বিরোধিতার কার্যত ফলাফল ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো যাচাই-বাচাইয়ের প্রয়োজন বোধ করে না।

ইসলাম মানেই জাগরণ

জাগ্রত হওয়াই ইসলামের প্রকৃতি। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে এ ধারা অব্যাহত থাকা চাই। এ যাত্রা যেন কোনোক্রমে থেমে না যায়। কেননা এ উম্মত নির্বাচিত উম্মত। এ উম্মত মানুষের পাল কিংবা সাধারণ মানুষের কোনো দলের মতো নয়। বরং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুগত এ উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা গোটা মানব গোষ্ঠীর পরিশুদ্ধি ও কল্যাণের জন্যে প্রেরণ করেছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ উম্মতের উক্ত বৈশিষ্ট্যই বর্ণনা করেছেন। তিনি একবার সাহাবায়ে কেরামকে বললেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ

"তোমাদেরকে সহজকরণকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে,
কঠোরতা সৃষ্টিকারী হিসেবে নয়।"[১]

হযরত রবয়ী ইবনে আমের র.কে ইরানের সেনাপ্রধান রুস্তম জিজ্ঞেস করেছিল, কোন জিনিসের আকর্ষণ তোমাদেরকে ইরান নিয়ে এলো?

১. জামে তিরমিযী, ১/২৭৫, হা. নং ১৪৭

তোমরা আরবের মরুভূমি থেকে কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ? তিনি জবাবে বলেছিলেন:

الله ابتعثنا لنُخرج من شاء من عبادة الناس إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

"আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন মানুষকে মানুষের উপাসনা (ইবাদত) থেকে বের করে এক আল্লাহর ইবাদতে নিমজ্জিত করার উদ্দেশ্যে। পার্থিব কষ্ট থেকে বের করে স্বচ্ছলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে এবং বিভিন্ন ধর্মের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার ছায়াতলে সমবেত করতে।"[১]

আল্লাহ তা'আলার বাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উক্তি আর কার হতে পারে! আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"[২]

এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে একটি উম্মত প্রেরণ করাও উদ্দেশ্য ছিল। এমন একটি উম্মত, যা সচেতন ও জ্ঞানী এবং সরল পথের আহ্বানকারী। সর্বকালের সর্বস্থানের মানুষের পথপ্রদর্শনই তাদের দায়িত্ব। গোটা মানবজাতির ধ্যান-ধারণা ও আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ করা এবং এ বিষয়ে নজরদারি করা তাদের একান্ত কর্তব্য। কবি সম্রাট আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল রহ. বলেন:

ہے حقیقت جس کے دیں کی احتسابِ کائنات

যাদের দ্বীনের বৈশিষ্ট্য জগতবাসীর হিসাব নেয়া।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (তারীখ ইবনে কাসীর)

২. সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১১০

ইসলামী জাগরণ সর্বকালের সকল মানবজাতির প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য-বস্ত্র, পানি ও বাতাসের চেয়ে মোটেও কম নয়। এটা মানবজাতির জন্যে সমানভাবে উপকারী ও প্রয়োজনীয়। এর অনুপস্থিতি শুধু ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে নয় বরং গোটা মানবসমাজের ধ্বংসের কারণ। ইসলামী দাওয়াত ও জাগরণ ব্যতীত সকল জাতি ও ধর্মের অবস্থা রাখালবিহীন এক পশুর পালের ন্যায় কিংবা চালকবিহনীন একটি যাত্রী বোঝাই জাহাজের মতো।

সমকালীন সময়ে ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী জাগরণের প্রয়োজন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। কেননা এটা জৈবিক চাহিদা, মতভেদ ও অধিক সন্দেহের যুগ। তাই অন্যান্য যুগের তুলনায় আমাদের এ যুগে ইসলামী জাগরণের প্রয়োজন ও এর দায়ভার অনেক বেশি। সুতরাং বিশ্বের যেখানেই ইসলামী জাগরণ হবে তার সাথে আমাদের সহানুভূতি থাকতে হবে। আমরা স্বাগত জানাবো এবং সফলতার দু'আ করবো।

কিন্তু এ সহানুভূতি আমাদেরকে গঠনমূলক পর্যালোচনা, কল্যাণমূলক সমালোচনা, ইসলামী আকীদা মাফিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সঠিক রায় কায়েম এবং তদানুযায়ী ফয়সালা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! এ বিষয়ে আমি কিছু মতামত ও পরামর্শ পেশ করতে চাই। হতে পারে এ দ্বারা ইসলামী জাগরণে অংশ গ্রহণকারী দায়ীদের কোনো প্রকার উপকার হবে এবং সঠিক পথের দিশা অনুসন্ধানে ও কার্যত রূপরেখার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যাবে।

প্রথম মূলনীতি

ইসলামী আকীদার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে

ইসলামী দাওয়াত ও জাগরণকে স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করা, বিশ্বাসযোগ্য-সম্মানিত ও শক্তিশালী করার প্রথম শর্ত হচ্ছে, ইসলামী দাওয়াত ও জাগরণের কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আকীদার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য হতে হবে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তরীকা তথা সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের পন্থা ও আমল অনুযায়ী হতে হবে। দ্বীন

ও শরীআতের মাহের এবং বিজ্ঞদের বুঝ-ব্যাখ্যা অনুযায়ী হতে হবে। উম্মতের অধিকাংশ আলেমদের (جمہور امت) আকীদার সাথে মিল থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে, এসব উৎকৃষ্ট দাওয়াত রাজনৈতিক ধারা ও ক্ষণস্থায়ী আবেগের পেছনে ছুটে চলছে। বিশেষ কোনো আঞ্চলিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং ইসলামী সরকার গঠনের অনর্থক দাবিদার যেন না হয়। আর এরূপ হলে যুবকরা যেন তা চোখ বন্ধ করে স্বাগত না জানায়। অধিকাংশ সময় যুবকরা প্রতিরোধের পরিবর্তে পক্ষপাতিত্বে আবেগপূর্ণ হয়ে ওইসব দাওয়াত ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দের আকীদাও যাচাইয়ের প্রয়োজন বোধ করে না– তারা যেন ওইসব নেতাদের সর্বসম্মত আকীদা থেকে দূরে থাকা, এমনকি সর্বসম্মত আকীদার বিরূপ আকীদা পোষণ করাকে দৃষ্টিগোচর না করে। কারণ সঠিক আকীদা এমন একটি প্রবাহমান দরিয়া, যা সর্বদা সঠিক পথে চলে। এ প্রবাহ কখনও থামে না; কখনও দিক বদলায় না। পক্ষান্তরে যেসব ঢেউ খুব জোরেশোরে-দ্রুতবেগে এগিয়ে আসে তা আবার ওই গতিবেগেই বিলীন হয়ে যায়। যেসব খাল-বিল জোয়ারে ভেসে উঠে আবার ভাটিতে শুকিয়ে যায় তার উপর আস্থা রাখা যায় না। হতে পারে এগুলো সকালে বিদ্যমান কিন্তু বিকালে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গভীর ও নিরপক্ষভাবে যাদের ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে তারা জানেন, ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে এমন বহু আন্দোলন ও সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার মধ্যে ছিল বহু চাকচিক্য ও আকর্ষণ। এক সময় তা ছিল খুব জনপ্রিয়। এরূপ ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করা স্বাধীন চেতা ও জ্ঞানী হওয়ার পরিচয় বহন করত। তা ছিল সেযুগের নতুন
(up-to-date) ফ্যাশন। সেযুগের যুবকরা ওইসব ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করে তার পক্ষপাতিত্ব করতে গর্ব বোধ করত। কিন্তু এগুলো বেশিদিন টিকেনি। বরং বাতাসের তোড়ে বিলীন হয়ে গেছে। আর শুধু ইতিহাসের পাতায় স্মৃতি আছে। যারা ইসলামী আকীদা, ইসলামী দর্শন ও বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে ততটা অধ্যয়ন করেননি তারা হয়তো এগুলোর নামও শোনেননি।

দ্বিতীয় মূলনীতি

দ্বীনের গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন

ইসলামী জাগরণের বহুবিধ উপকারিতার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, ইসলামী জাগরণের দায়ী ও অগ্রদূতগণ যেন কুরআন-হাদীসের জ্ঞানশূন্য না হন। বরং এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তাদের দ্বীনী জ্ঞানের মধ্যে প্রশস্ততা ও গভীরতা সৃষ্টি করা উচিত। ইসলামী জাগরণের আন্দোলনে দিনদিন শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তাদেরকে মানসিক ও ধ্যান-ধারণার প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। সঠিক ও শক্তিশালী আত্মার খোরাক প্রদান করা আবশ্যক। এ দ্বারা তাদের চিন্তাধারার খালিঘরগুলো পূরণ হবে এবং তারা সঠিক জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস পুনরায় দৃঢ় হবে যে, *একমাত্র ইসলামই সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে এবং দিতে পারে জীবনের সকল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান।* এসব শিক্ষিত যুবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, যাতে তারা আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে কুরআন-হাদীসের সাথে মজবুত ঈমানী ও ইলমী সম্পর্ক স্থাপন করে। তারা যেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সীরাত, ইসলামের ইতিহাস এবং ধর্ম সংস্কারক ও মাশায়েখদের জীবনী অবশ্যই অধ্যয়ন করে। এ দ্বারা তাদের সার্বিক যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত হয়ে যাবে। তারা তাদের যোগ্যতার উত্তম ব্যবহার এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে মহাসাফল্য লাভ করতে পারবে– যদি তাদের এসকল প্রচেষ্টা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হয়ে থাকে।

তেমনিভাবে এটাও একটি আবশ্যকীয় বিষয় যে, তাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পরিশুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভ্যাস-চরিত্র শুদ্ধকরণে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। তাদেরকে এমন উত্তমরূপে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে যেন তাদের মধ্যে কোনো কমতি না থাকে। বরং তারা যেন উত্তম আখলাক ও উৎকৃষ্ট চরিত্রে অন্যদের জন্যে আদর্শ (Ideal) হতে পারে। কেননা দায়ী ও ইসলাহের পথের পথিকদের গুণাগুণ ছিল সর্বদা এমনই। কিন্তু আজকাল ইসলামী সমাজ চারিত্রিক অবনতি, পরস্পরে মতভেদ, অমুসলিমদের প্রভাব,

অনৈসলামী প্রথা এবং প্রদর্শনী মনোভাবের মারাত্মকভাবে শিকার। এমনকি দাওয়াত ও ইসলাহে কার্যরত কর্মীদের মধ্যেও এরূপ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং ইসলামের শত্রুরা এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইসলামের সমালোচনা করার সুযোগ পেয়ে থাকে। দায়ীদের মধ্যে উত্তম-উৎকৃষ্ট ইসলামী চরিত্র বিদ্যমান থাকলে এসব সমালোচনা থেকে বাঁচা সম্ভব এবং মুসলমানদের এ উৎকৃষ্ট চরিত্র ইসলামের প্রচার-প্রসারে সহায়কও বটে।[১]

তৃতীয় মূলনীতি

যুগ ও যুগের সমস্যার জ্ঞান থাকা জরুরি

দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি চলমান যুগের সমস্যাবলীর জ্ঞান থাকাও জরুরী। এ জ্ঞান থাকা উচিত যে, বর্তমান যুগে কোন কোন মতবাদ ও কী কী আন্দোলন রয়েছে। জনজীবনে এর প্রভাব কী। এগুলি ইসলামের জন্যে, মুসলমান প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্যে কতটুকু ক্ষতিকর। দেশের শাসনক্ষমতা লাভের চেষ্টায় ব্যস্ত নেতৃবৃন্দ কোন ধাঁচের। তারা সমাজকে কীরূপ ধ্যান-ধারণায় রূপান্তর করতে চায়। জীবনধারাকে কোন পথে পরিচালনা করতে চায়। কেননা এসব শক্তি, নেতৃবৃন্দ ও আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা; ইসলামী দলগুলোর নিজ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকা; সকল প্রচেষ্টা শুধু দ্বীনী দাওয়াত, দ্বীনের উপর অটল থাকা তথা ফরয-ওয়াজিব যথাযথ পালন করা এবং শুধু ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে ক্রমান্বয়ে দ্বীন ও শরীআতের উপর আমল করার স্বাধীনতাও ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে। দ্বীনদার শ্রেণী ও দ্বীনের দায়ীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। তাদের

---

১. মুসলমানদের দুর্বল চরিত্র ও দ্বীনের উপর দৃঢ় না থাকার কারণে ভিনধর্মীরা সহজে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় না। এমনকি নওমুসলিমরা পুনরায় তাদের ধর্মে ফিরে যায়। এ ধরণের একটি ঘটনা মুলতান, পাকিস্তানের কারী মুহাম্মাদ হানীফ রহ. বর্ণনা করেছেন: এক হিন্দু যুবক মুসলমান হয়ে ছয় পারা কুরআন শরীফ হিফয করার পর পুনরায় হিন্দু হয়ে যায়। তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে সে বলে, মুসলমানরা নিজেরাই তাদের ধর্ম পালন করে না! তারা সুদ-ঘুষ-মদ খায়। জুয়া খেলে। যিনা করে। তাহলে আমি মুসলমান হয়ে অযথা কষ্ট করব কেন? তাই পুনরায় হিন্দু হয়ে গেলাম। [অনুবাদক]

এমন দুরবস্থার কথা কুরআন মাজীদ এভাবে চিত্রায়িত করেছে:

﴿حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ﴾

"যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠল।"[১]

অর্থাৎ মুসলমানরা শরীআহ বিরোধী ও দ্বীনের শত্রুদের দয়া-মায়ায় জীবন যাপন করবে। অনৈসলামী আইন প্রণয়ন, ইসলামী আইনে শত্রুদের হস্তক্ষেপ, মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরোধিতা এবং পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে। অবস্থা এমন হবে যে, "ধর্ম হবে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, যার সম্পর্ক শুধু বান্দা ও আল্লাহর সাথে। জীবনব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে এর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"[২]

বাস্তবতা থেকে দৃষ্টিগোচরের পরিণাম

বহু মুসলমান যুগ ও জাগতিক জ্ঞানকে গুরুত্ব দেন না। তারা বর্তমান যুগ, যুগের সমস্যাবলী, মুসলিম সমাজের জন্যে ধ্বংসাত্মক শিক্ষাব্যবস্থা ও অশুভ ধ্যান-ধারণা নিয়ে আলোচনা করা এবং ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের বিভিন্ন পন্থার মাঝে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করারও প্রয়োজন বোধ করেন না। বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামের এমনও দায়ী রয়েছেন যারা উক্ত বিষয়টি চোখের আড়াল করে রেখেছেন। তারা বলেন, সমাজে

---

১. সূরা তাওবা, ৯: ১১৮

২. আজকাল বহু মুসলমান এরূপ কথাবার্তা বলে থাকেন। যার সারমর্ম হচ্ছে, "ধর্ম থাকবে মসজিদ-মাদরাসায় সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে ধর্মের কী সম্পর্ক? রাজনীতির সাথে ধর্মকে যুক্ত করা মূলত ধর্মের অপব্যবহার। সুতরাং ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হোক, যাতে আমরা ধর্মের বালাই থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তমনে রাজনীতি (যার নেই কোনো নীতি) করতে পারি। আর রাজনীতিতে ধর্মের দরকার হবে কেন? রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আব্রহাম লিংকন (Abraham Lincoln) প্রদত্ত গণতন্ত্রই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আমরা আধুনিক হতে চাই। এক্ষেত্রে আমাদের আইডিয়াল (তথাকথিত) আধুনিক ইউরোপ। তারা অধুনিক ও মুক্তমনা মানুষ হওয়ার জন্যে ধর্মকে জাদুঘরে পাঠিয়েছে। আমরাও অধুনকি যুগের আধুনিক মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে তাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে ধর্মকে জীবন থেকে বিসর্জন দিতে চাই। ধর্মকর্ম করতে গেলে অনেক কিছু করা যায় না; খাওয়া যায় না। সুতরাং গণতন্ত্রই উত্তম ধর্ম। গণতন্ত্র জিন্দাবাদ; পুঁজিবাদ জিন্দাবাদ!" [অনুবাদক]

বিদ্যমান ধ্যান-ধারণা ও সমস্যাবলী নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই। আর এতে তেমন কোনো উপকারিতাও নেই। সমাজ স্বাধীন ও ধর্মহীন ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করছে কিনা, ভালো কাজে লিপ্ত হচ্ছে না মন্দ কাজে তা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। আল্লাহ তা'আলার লক্ষ-কোটি শোকর যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের মতো নেয়ামত দান করেছেন এবং তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা স্বাধীনভাবে নামায-রোযা পালন করতে পারি।

তাদের ইসলাম ও ইখলাসের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের প্রচেষ্টা ও কোরবানী বহু প্রসংশার দাবিদার। তবুও বলতে চাই, আশপাশের পরিবেশ থেকে দৃষ্টিগোচর, যুগের দাবি ও প্রয়োজন থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু ব্যক্তিস্বার্থে সীমাবদ্ধ থাকা ইসলামের সঠিক বুঝের ফলাফল নয়। বরং ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে সজাগ দৃষ্টি, বাস্তবতা, সমস্যা ও সম্ভাবনার জ্ঞান, বন্ধু ও শত্রুর পরিচয় থাকা এবং অনর্থক শ্লোগানের প্রতারণা থেকে নিজেকে দূরে রাখা অত্যাবশ্যকীয়। মুসলমান কখনও জাতীয়তাবোধ, বংশগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক শত্রুতায় লিপ্ত হবে না। বরং চালাক রাজনীতিবিদ এবং ভিনদেশী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে। নিজেদের সরলতা, দ্বীনের সঠিক বুঝের অভাব এবং ঈমানী দূরদর্শিতা না থাকার কারণে দ্বীনী পরিবেশ সৃষ্টি, ইসলামী শরীআহ প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী শাসন কায়েমের সকল প্রচেষ্টা যেন ব্যর্থ হয়ে না যায় এবং মুসলিম সমাজ ও মুসলিম দেশগুলো যেন সেকুলার শাসনব্যবস্থা, পশ্চিমা ও ধর্মহীন ধ্যান-ধারণার শিকার না হয়। আজকাল স্বাধীন ধ্যান-ধারণা খুবই জনপ্রিয় এবং তাদের নিকট প্রাণপ্রিয়ও বটে, যারা পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত। পশ্চিমা সভ্যতায় সভ্য এবং আখলাক-চরিত্র ধ্বংসকারী মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত।[১]

---

১. এর জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে পাকিস্তানের ১৯৮৮ সালের নির্বাচন। যে দেশ ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা আইডিয়াল হিসেবে পেশ করার জন্যে বহু কোরবানী পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ এর বিরপীত। অধুনিকতার দাবিদার, ইসলামী আইন ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধচারণকারীরা শরীআহ প্রতিষ্ঠার দাবিদারদের বিপক্ষে বিজয়ী হয়েছে। ফলে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সর্ববৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্রের একজন স্বাধীনচেতা নারী (জুলফিকার আলী ভুট্টোর কন্যা বেনজীর ভুট্টো, ১৯৫৩–২০০৭) রাষ্ট্রপ্রধান পদে নিযুক্ত হন। অথচ সেদেশে লক্ষ লক্ষ উলামায়ে

প্রথম ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য

সাহাবায়ে কেরাম র. ইসলামী জ্ঞান ও দূরদর্শিতা এবং ঈমানী শক্তির গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁরা নিজেরা ধোঁকা খেতেন না এবং কাউকে ধোঁকা দিতেন না। তাঁরা ছিলেন এসবের উর্ধ্বে। আমাদের অনেকেই তাদের এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না যে, সাহাবায়ে কেরাম র. ধোঁকা-প্রতারণার শিকার হতেন না। বাস্তবে তাঁরা বড় জ্ঞানী এবং সর্বদা সজাগদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। তাদের মেজাজ ও বুঝ-বিবেক এমন ছিল যে, দ্বীনী মেজাজ এবং ইসলামী শিক্ষার বিপক্ষে কোনোকিছুই বরদাশত করতেন না। আকর্ষণীয় ও প্রতারণামূলক শ্লোগানে কর্ণপাত করতেন না। অনৈসলামী ধ্যান-ধারণার শিকার হতেন না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল দৃঢ়তম এবং তাঁকে মা'সূম (নিষ্পাপ) মনে করতেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ○

"তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।"[১]

আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ব্যক্তিত্ব সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে নিজ সন্তান-সন্তুতি, পিতা-মাতা এমনকি তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় ছিল। মানব ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অন্য কোনো দল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মতো কোনো নবী কিংবা কোনো দায়ীর জন্যে এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেনি। তবে তারা অতিভক্তি ও মাখলূকের ইবাদত পরিহার করেছিলেন। কেননা তা শুধু আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত।

কেরাম রয়েছেন। হাজার হাজার মাদরাসা রয়েছে। আর দ্বীনী সংস্কারের লক্ষ্যে অসংখ্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

১. সূরা নাজম, ৫৩: ৩-৪

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একবার ইরশাদ করেন:

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا

"তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে নিপীড়নকারী হোক বা নিপীড়িত!"[১]

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্ত হাদীস শুনে সাহাবায়ে কেরাম চুপ থাকতে পারেননি। তারা এ হাদীসের ব্যাখ্যা জানতে চান। হাদীস বিশারদগণ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এটা মূলত জাহেলী যুগের প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ। আর জাহেলী যুগের স্বভাব ছিল এমনই। এজন্যই 'দীওয়ানে হামাসা'র কবি 'বনী মাযেন' নামক একটি আরব গোত্রের প্রশংসায় বলেন:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم

فى النائبات على ما قال برهانا

"তাদের উপর কোনো বিপদাপদ এলে তারা গোত্রীয় ভাইদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকে;
তখন তারা সত্যতা যাচাই-বাচাই করে না, বরং সাহায্যের জন্যে দৌঁড়ে চলে আসে।"

এজন্যই একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে আল্লাহর রসূল! মাজলুম তথা নিপীড়িত ব্যক্তির সাহায্যের কথা তো বুঝে আসে, কিন্তু আমরা জালেম তথা নিপীড়নকারীর সাহায্য করব কীভাবে?" সাহাবায়ে কেরামের এ সাহস দেখে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রাগান্বিত হননি এবং অপছন্দের কোনো ভাব চেহারায় প্রকাশ পায়নি। বরং খুব প্রশান্ত মেজাজে উত্তর দিলেন, "জালেমকে জুলুম থেকে বিরত রাখো, এটাই তার জন্যে সাহায্য।"

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুমিন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মুমিন ব্যক্তির বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে বলেন, "মুমিন ব্যক্তি কখনও এক ছিদ্র দিয়ে দু'বার দংশিত হয় না।"[২]

---

১. সহীহ বুখারী, ৩/১২৮, হা. নং ২৪৪৩

২. (لَا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ) মুসনাদে আহমাদ, ১৪/৪৯৭, হা. নং ৮৯২৮

অন্যত্র ইরশাদ করেন, "তোমরা মুমিন ব্যক্তির দূরদর্শিতাকে ভয় করো, কেননা সে আল্লাহর নূরের মাধ্যমে অবলোকন করে থাকে।"[১]

যেহেতু ইসলামী সমাজ মুমিনদের সমষ্টিতে গঠিত। তাই সকল যুগের, সকল দেশের ইসলামী সমাজ এমন হওয়া উচিত যে, তারা কারও সাথে প্রতারণা করবে না এবং নিজেরাও প্রতারিত হবে না। একই ছিদ্র দিয়ে বারবার দংশিত হবে না অর্থাৎ একই পন্থায় বারবার প্রতারিত হওয়া মুমিনের শান নয়।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের গুরুত্ব

জিহাদের দিকে মনোনিবেশ করাও অত্যাবশ্যকীয়। খাঁটি কুরআনী ও ইসলামী জিহাদের সম্মান ও গুরুত্ব মন-মস্তিষ্কে থাকা চাই। এর মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতি অমনোযোগী হওয়া অনুচিত। পবিত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রে 'মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ'র উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তিবর্গের পদাংক অনুসরণের শখ এবং অন্তরে 'শহীদ' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। এটা অনেক বড় ঈমানী সম্পদ। জিহাদের শখ আর শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই এ উম্মতের নতুন-পুরাতন সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির বৈশিষ্ট্য। জিহাদের কারণেই তারা এ মহান বীরত্ব ও নজিরবিহীন কোরবানী পেশ করতে পেরেছেন। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এরূপ পূত-পবিত্র দলের সমর্থনে ছিল। এ মহাশক্তি ও মহাসম্পদ তথা জিহাদ থেকে দূরে থাকার কারণে মুসলিম উম্মাহ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। জিহাদের শূন্যতা এমন একটি খালিঘর, যা শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। এ আকাঙ্ক্ষা সজীব রাখতে ওইসব কিতাবাদি সহায়ক হবে, যা পড়লে বা শোনলে দ্বীনের দায়ীদের মধ্যে দ্বীনী সম্ভ্রম ও সম্মানবোধ জেগে উঠে। অন্তরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং দ্বীনকে সমুন্নত-শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জীবন, জীবনের সকল সুখ-শান্তি ও পদ-মর্যাদা তুচ্ছ এবং মূল্যহীন মনে হয়।[২]

---

১. (اتَّقُوْا فِرَاسَةَ المُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ) জামে তিরমিযী, ৫/২৯৮, হা. নং ৩১২৭

২. যেমন– রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুদ্ধের ইতিহাস, হাদীসগ্রন্থের জিহাদের অধ্যায়সমূহ, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জীবনী অথবা সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহ. এর

জাগ্রতকারী সংগঠনগুলিই ঘুমিয়ে পড়েছে

ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। অথচ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় না। তা হলো, ওইসব সংগঠনগুলি নিজেরাই ঘুমিয়ে পড়েছে, যারা মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা জাগ্রত করতে মাঠে নেমেছিল। শেওলা বদ্ধমূল ইসলাম নামক দরিয়া প্রবাহমান করতে চেয়েছিল। অযৌক্তিক ও শরীআতের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন সকল প্রচলিত রসম-রেওয়াজ সমাজ থেকে দূর করতে চেয়েছিল। মুসলিম সমাজের চিন্ত া-চেতনা তরান্বিত করে নিহিত যোগ্যতা জাগ্রত করতে চেয়েছিল, যাতে নতুন প্রজন্ম বর্তমান যুগ ও যুগের সমস্যাবলী অনুধাবন করে যুগানুপাতিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। যুগোপযোগী নেতৃত্ব দিয়ে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং কার্যতভাবে (Practically) প্রমাণ করতে পারে যে, ইসলাম সর্বকালে সর্বাবস্থায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। প্রত্যেক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব (Leadership) দেয়ার যোগ্যতা ইসলামের মধ্যে রয়েছে। এসব সংগঠন বিভিন্ন অপশক্তির মোকাবিলা করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু যুগের তালে তালে তারা নিজেরাই ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা বিভিন্ন অপশক্তির শিকার হয়েছে। তারা পুরনো পদ্ধতি ও পূর্বেকার নীতিমালায় আটকে আছে। প্রাথমিক অবস্থায় সংগঠনগুলোর জন্যে যে নীতিমালা তৈরি করা হয়েছিল তা একটি নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট সীমারেখায় উপযুক্ত ও কার্যকর ছিল। সংগঠনগুলোর প্রথম নেতারা তাদের যুগের দাবি অনুযায়ী ইখলাস এবং বিবেক-বুদ্ধির আলোকেই দলের নীতিমালা তৈরি করেছিলেন। তাদের সামনে ছিল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই হাদীস :

"يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهٗ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ"

নির্ভীক সঙ্গীদের বীরত্বের ঘটনা ও জিহাদের ইতিহাস সম্বলিত অধমের (মাও. আলী মিয়া রহ. এর) রচিত কিতাব 'সাইয়েদ আহমাদ শহীদ চরিত' এবং 'যখন ঈমানের বসন্ত এলো' ইত্যাদি অধ্যয়ন করুন।

"প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভালো লোকেরা এ ইলম শিখবেন। তারা এতে সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিল লোকদের মিথ্যা আরোপ এবং জাহেল-মূর্খদের কদর্থ (তাবীল) দূর করবেন।"[১]

কিন্তু এসব দল ও সংগঠন পূর্বকালীন অস্থায়ী নীতিমালা ঐশী বাণীর ন্যায় আঁকড়ে ধরে রেখেছে, যেন এতে কমবেশি করা বা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। এ কারণেই এসব সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মানসিকভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমনকি তাদের ভেতরে মাঝেমধ্যে কট্টরপন্থী মনোভাব দেখা যায়। তারা নিজেদের কর্মপদ্ধতি থেকে বিন্দুমাত্র সরতে চায় না, যেন এটা শরীআতের অপরিবর্তনীয় কোনো বিধান বা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত কোনো বাণী।

এর কারণ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, এসব সংগঠনের ক্রমবিকাশ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতির নতুনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষণের যোগ্যতা তাদের নেই। যুগ ও যুগের চাহিদা, বিদ্যমান সমস্যাবলী, সংস্কার ও দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি এবং জীবনের বাস্তবতা ও চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করতে তারা অক্ষম।

অথচ বাস্তবচিত্র হচ্ছে, *ইসলাম কখনও যুগের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। ইসলাম যুগে যুগে মানবসমাজকে নেতৃত্ব (Leadership) দিয়েছে। ইসলামী শিক্ষা এবং যুগের চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করে নিজ যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে।* প্রত্যেক যুগেই এমন উলামা ও নেতৃবৃন্দ ছিলেন, যাদের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান ছিল প্রগতিশীল। তারা দ্বীনের মূলনীতি এবং শরীআতের মূল উৎস (কুরআন-সুন্নাহ) থেকে বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসায়েল বের করতে সক্ষম ছিলেন। তারা এক অতুল্য ও নজীরবিহীন মেধার পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেক যুগে-প্রত্যেক স্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন। যুগের দাবি এবং মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন মিটিয়েছেন। তারা কখনও জীবনধারার বাস্তবচিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। সময়ের দাবি ও যুগের প্রতিধ্বনির প্রতি সর্বদা কান সজাগ রেখেছেন। তারা মানবসমাজে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে ইসলামের সরল পথ

১. সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, ১০/২০৯, হা. নং ২০৭০০

প্রদর্শন করেছেন। এজন্যই সকল যুগে জীবনের সর্বস্তরে ইসলামের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বাধিক।[১]

অনর্থক বাধা-বিপত্তি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়

ইসলামী দাওয়াতের উপকারিতা টিকিয়ে রাখা ও ফলপ্রসূ করার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, সাংগঠনিক ও দাওয়াতি কার্যপন্থা ইতিবাচক (Positive) হতে হবে। তা যেন নেতিবাচক (Negative) না হয়। শুরুতেই যেন সরকার, সরকারি বাহিনী বা শক্তিধর ব্যক্তি-বর্গের সাথে টক্কর না হয়। এ দ্বারা নিজেদের জন্যে সমস্যা এবং বাধা সৃষ্টি হয়। সকল শক্তি ও যোগ্যতা ওইসব বাধা-বিপত্তি প্রতিহত করার পেছনে বিনষ্ট হয়ে যায়। অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু তৈরি হয় এবং যথা-অযথা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে শত্রুর পরিবর্তে নিজেদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হয়।

পক্ষান্তরে ইতিবাচক দাওয়াতের গুরুত্ব অনেক বেশি। বরং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করতে হবে যে, *ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কাছে ঈমানের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। তাদের হাতে ইসলামের পতাকা (নেতৃত্ব) তুলে দিয়ে তাদের মাধ্যমে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।* এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয় যে, ঈমানদার ব্যক্তিদের কিংবা ইসলামী সংস্কারমূলক সংগঠনকেই ক্ষমতায় যেতে হবে। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন এবং সামাজিক-ইসলামী বিপ্লব ঘটানোর দায়িত্ব কোনো নির্দিষ্ট দল বা ব্যক্তিবর্গের জন্যে বরাদ্ধকৃত নয়।

পুনর্জাগরণ ও সংস্কারের একটি উত্তম উদাহরণ

আমি ইতিহাসের পাতায় হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী রহ. (১৫৬৪-১৬২৪ ঈ.) এর মতো ধর্মসংস্কারক এমন কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন দেখিনি যিনি অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে, ইতিহাসের ধারা বদলাতে কিংবা সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে তাঁর মতো

---

১. এক কথায় তারা ছিলেন জিনিয়াস (Genius) তথা প্রতিভাবান। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে লেখকের কিতাব 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) এর প্রথম খণ্ড অধ্যয়ন করুন।

সফলতা লাভ করেছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর সফলতার একটু ধারণা পেতে 'ربّانية لا رهبانية' কিতাবের একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।[১]

"ভারতবর্ষে বাদশাহ জালালুদ্দীন আকবরের সরকার ধর্মবিরোধী ও স্পষ্ট নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করেছিল। বাদশাহ আকবরের মতো প্রভাবশালী বাদশাহ নিজের সকল শক্তি-সামর্থের জোরে ইসলামকে হিন্দুস্তান থেকে চিরতরে বিদায় করার পায়তারা করেছিল। তার দরবার ছিল বুদ্ধিজীবীদের আস্তানা, যারা ছিলেন তার পরামর্শদাতা। বাদশাহ আকবরের সরকার যৌবনকাল অতিক্রম করছিল। সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সম্ভাবনাও ছিল না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে হচ্ছিল না। ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দা শায়খ আহমাদ সারহিন্দীকে ধর্মসংস্কারকরূপে দাঁড় করালেন। তিনি বিপ্লবী পতাকা আর ঈমানী শক্তি নিয়ে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে বিপ্লব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একাই ঝাপিয়ে পড়েন। এর ফলে মুঘল রাজ্যের পরবর্তী প্রত্যেক বাদশাহ তার পূর্বের বাদশাহর তুলনায় ভালো প্রমাণিত হন। সর্বশেষে আওরঙ্গজেব আলমগীরের মতো শিক্ষিত, জ্ঞানী, ফকীহ, সাহসী ও নেক বাদশাহ হিন্দুস্তান উপহার পায়। ইসলামী শাসনের ইতিহাসে তার মতো বাদশাহ ছিলেন খুবই কম। এ বরকতপূর্ণ বিপ্লবের নেতা ছিলেন সিলসিলায়ে মুজাদ্দিদীর ইমাম শায়খ আহমাদ সারহিন্দী রহ.।"[২]

অবস্থা পরিবর্তনের এ প্রচেষ্টায় সফলতার মূল মন্ত্র ছিল এই যে, শায়খ আহমাদ সারহিন্দী রহ. নেতিবাচকের পরিবর্তে ইতিবাচক দিককে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। শাসক গোষ্ঠী তথা বাদশাহ, মন্ত্রীসভা এবং সরকারি লোকদের মধ্যে ইসলামী সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের অন্তরে নিহিত ঈমানকে ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, "আমি রাজত্ব চাই না। আমি, আমার সন্তান-সন্ততি, আমার কোনো মুরীদ বা ছাত্রের মনে এরূপ স্বপ্নও জাগে না। বরং আমি এ দেশকে ব্রাহ্মধর্ম,

---

১. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আলী মিয়া নদভী রহ. সংকলিত 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস'র ৪র্থ খণ্ড ও 'রাব্বানিয়্যা লা-রাহবানিয়্যা' অধ্যয়ন করুন।

২. রাব্বানিয়্যা লা-রাহবানিয়্যা, পৃ. ১৩৭-১৩৮

হিন্দুদর্শন এবং জাহেলী যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কবল থেকে রক্ষা করতে চাই। যেদেশ বিজয় ও ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বহু রক্ত দিয়েছেন। আমার ইচ্ছা হয়, ইসলামের প্রতিরক্ষা ও শরিআহ আইন প্রতিষ্ঠার এ সৌভাগ্য বাদশাহ, মন্ত্রীসভা এবং সেনাপ্রধান গ্রহণ করুক।" তাঁর এ বক্তব্য শাসকগোষ্ঠীর অন্তরকে নাড়া দিয়ে গেল। ফলে বদলে গেল তাদের মন-মানসিকতা। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ইসলামের প্রতীক নিধনের পরিবর্তে ইসলাম প্রতিরক্ষার কাজে লেগে যান এবং ব্রাহ্মধর্ম ও পৌত্তলিক (প্রতিমাবিশিষ্ট) ধর্মের প্রতীকসমূহের নিধন শুরু করেন, যা বাদশাহ আকবরের শাসনামলে অধিকহারে প্রচার পেয়েছিল।

বাদশাহ আকবর গাভী জবাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। কারণ হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা গাভীকে বরকতময় মনে করে তার পুজা করে থাকে। বাদশাহ আকবরের শাসনামলে কেউ গাভী জবাই করলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। পক্ষান্তরে শূকর জবাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বাদশাহ আকবরের পুত্র বাদশাহ নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর শায়খ মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ. এর ইখলাস ও তাকওয়া দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। শায়খের সংশ্রবে কয়েকদিন থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। কাঙ্গড়ার কেল্লা কোনো মুসলমান বিজেতা ফতেহ করতে পারছিল না। পরবর্তীতে এক হিন্দু সেনা কর্মকর্তার হাতে কেল্লা ফতেহ হয়। কেল্লা বিজয়ের পর বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রবেশ করে সর্বপ্রথম নির্দেশ দিলেন, "এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক এবং গাভী জবাই করা হোক।" এ ঘটনা দ্বারা বাদশাহ জাহাঙ্গীর রহ. ও তার পিতার কর্মপদ্ধতি, রাজনীতি ও চিন্তাধারার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রতীয়মান হয়।

চতুর্থ মূলনীতি

পদমর্যাদা বিমুখতা

ইসলামী দাওয়াত ও জাগরণের চতুর্থ মূলনীতি হচ্ছে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ পদমর্যাদা, সুখ-শান্তির জীবন এবং দুনিয়াদারদের ন্যায় শান-শওকত অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকবেন। শরীআতের সীমারেখায় থেকে যথাসম্ভব তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল এবং অল্পে তুষ্টির মহৎ গুণে গুণান্বিত হবেন। বুজুর্গানে কেরাম এবং দ্বীনের জন্যে যারা কষ্ট সহ্য

করেছেন তাদের পদাংক অনুসরণ করবেন। এ বিষয়ে অধমের সংকলিত 'ইসলামী চিন্তাবিদ ও দায়ীগণ' গ্রন্থ থেকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. চরিতের কিছু উক্তি পেশ করছি।

ইসলামের ইতিহাসে সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা ও তাকওয়া আমরা পাশাপাশি দেখতে পাই। ইসলামী ইতিহাসের যেসব ব্যক্তিবর্গ যুগের গতিধারা বদলে দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ইসলামী সমাজে নতুন চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা ও দ্বীনের ক্ষেত্রে এমন অতুলনীয় অবদান রেখেছিলেন, যা পরবর্তী কয়েক শতকের সাহিত্য এবং মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিত করেছিল। এসব ব্যক্তিবর্গ তাকওয়া, অল্পে তুষ্টি এবং দুনিয়াবিমুখতার মহান গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তারা প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদা এবং ধনশীল ও পদমর্যাদাশীলদের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। এর কারণ হচ্ছে, দুনিয়াবিমুখতা, অল্পে তুষ্টি এবং তাকওয়া মানুষের মধ্যে গোপন শক্তি ও বিশ্বাস এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। আর তাদের দৃষ্টিতে পার্থিব সম্পদে আসক্ত মানুষ এবং ভোজনপ্রিয়, জৈবিক ও যৌন চাহিদার পূজারী ব্যক্তিদের কোনো মূল্যায়ন থাকে না। এজন্যই আমরা লক্ষ্য করি, অসাধারণ ও আদর্শবান ব্যক্তিত্ব অল্পে তুষ্টি এবং দরবেশী জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে থাকেন। লোভ-লালসা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। আপন যুগের রাজা-বাদশাহ, ধনী ও বিত্তশীলদের থেকে বহুদূরে থাকেন। কারণ তাকওয়া মানুষের নিহিত শক্তি বৃদ্ধি করে। যোগ্যতার প্রকাশ ঘটায়। আত্মাকে শক্তিশালী করে। পক্ষান্তরে আয়েশ ও আরাম অন্তর দুর্বল করে দেয় এবং আত্মার মৃত্যু ঘটায়। নীতিশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে উক্ত বিষয়টির ভিন্ন ব্যাখ্যাও পেশ করা যায়। তবে আমি শুধু ঐতিহাসিক এ সত্যটি পেশ করতে চাই যে, পুনর্জাগরণ ও সংস্কারের অগ্রদূতদের তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারা যুগের স্রোতে ভেসে যাবেন না। আয়েশ ও আরামের জীবন এবং ধন-সম্পদ নিয়ে খেলা তাদের শান নয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্তের দাবি এমনই। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

"আপনি কখনও ওইসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, যা আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য ভোগ-বিলাসের উপকরণ স্বরূপ দিয়েছি, এসব পার্থিবজীবনের চাকচিক্য মাত্র। আর আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী।"[১]

আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদেরকে এ কথা বলে দেয়ার নির্দেশ করেছিলেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

"হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো! আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দিই।"[২]

আল্লাহ তা'আলা যেসব ব্যক্তিদেরকে এ মহান কাজের জন্যে নির্বাচিত করেন অথবা যারা এ মহান কাজের তরে নিজেকে পেশ করেন এবং এ মহান পদের আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাদের জন্যে আল্লাহর চিরস্থায়ী নিয়ম এমনই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে কুরবানী গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহর নিয়মে কোনো ব্যতিক্রম হয় না।[৩]

পঞ্চম মূলনীতি

বীরত্ব, নির্ভীকতা, ধৈর্য্য ও ত্যাগ

ইসলামী জাগরণের পঞ্চম মূলনীতি হচ্ছে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে বীরত্ব, সাহসিকতা, ধৈর্য এবং কোরবানী ও ত্যাগের মনোভাব থাকা চাই। যুগের দাবি অনুপাতে বিপজ্জনক অবস্থার মোকাবিলা করার সাহস ও শক্তি থাকা

১. সূরা ত্বা-হা, ২০: ১৩১

২. সূরা আহযাব, ৩৩: ২৮

৩. 'رجال الفكر والدعوة' (ইসলামী চিন্তাবিদ ও দায়ীগণ), খ. ১, পৃ. ১০৫

চাই। কেননা জনসাধারণ স্বভাবত মজবুত ঈমান, অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং বিপজ্জনক অবস্থার মোকাবিলা করার স্বভাবকে মূল্যায়ন করে থাকে। তারা এমন গুণ ও কীর্তনকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে, যা তাদের মধ্যে নেই। ইসলামের ইতিহাস অতুলনীয় ও বিস্ময়কর সাহসিকতার ঘটনায় পরিপূর্ণ।

উক্ত গুণ ও কীর্তনের অভাবের কারণে যে কমতি সৃষ্টি হয়েছে তা ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্যে বড়ই বিপজ্জনক। এ কারণে বহু অসাধু আন্দোলন আত্মপ্রকাশ ও প্রসারের সুযোগ পায়, যাদের আকীদাও ভুল, কর্মপদ্ধতিও ভুল। আর কর্মপদ্ধতি নেতিবাচক, ধ্বংসাত্মক ও বিবাদ-সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী। এতদসত্ত্বেও তাদের কথা মন-মস্তিষ্ককে এমনভাবে প্রভাবিত করে, যে প্রভাব কোনো বক্তৃতা বা সাহিত্য দ্বারা দূর করা সম্ভব নয়। এমনকি তর্কশাস্ত্র ও দার্শনিক যুক্তিও এর মোকাবিলা করতে অক্ষম। ইসলামীবিশ্বে বিভিন্ন সময়ের সেনা অভ্যুত্থান এর জ্বলন্ত প্রমাণ, যা ইসলামী শিরোনামে এবং অবস্থার পরিবর্তনের দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তারা ইসলামপ্রিয়দের দুর্বলতা দ্বারা সুযোগে সৎব্যবহারের ন্যায় শুধু ফায়দাই লুটেছে।[১]

---

১. মিসরের বর্তমান সেনা অভ্যুত্থান এর জ্বলন্ত প্রমাণ। সেদেশের সেনাবাহিনী দেশটির সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসীকে এক বছর (৩০ জুন, ২০১২ থেকে ৩ জুলাই, ২০১৩) যেতে না যেতেই ক্ষমতাচ্যুত করে। মুহাম্মাদ মুরসী সরকার গঠনের শুরুতেই শরীআহ আইন প্রতিষ্ঠা করতে এজন্য ভয় পেয়েছিলেন যে, এতে দেশের ভেতরে ও বাইরে তার দল ও সরকার অপশক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। কিন্তু তিনি যে বিষয়টি ভয় পেয়েছিলেন তাই ঘটেছে। তবে এটাই কি ভালো ছিল না যে, যেহেতু ভেজতেই হবে সেহেতু পানিতে নেমে ভেজাই ভালো ছিল!

এ সেনা অভ্যুত্থানের অশুভ পরিণামে সেদেশের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ শহীদ হয়। মূলত এ ঘটনা ঘটেছে ভিনদেশীদের ইশারায়। কেননা ইসলামপ্রিয় ইখওয়ানুল মুসলিমীন (Muslim Brotherhood) এর সরকার গঠনের পর থেকেই তাদেরকে উৎখাত করার জন্য আমেরিকা ও ইসরাইল ষড়যন্ত্র করে আসছিল। ইসরাইল কখনও চায় না যে, তার বিপক্ষের কোনো শক্তি বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক বা সরকার গঠন করুক। এজন্যই তারা আফগানিস্তান ও ইরাককে ধ্বংস করার পর এবার মিসর ও ইরানের পিছু নিয়েছে। সুতরাং মিসরকে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে। শত্রুকে চিনতে ও প্রতিহত করতে হবে এবং চোখ-কান খোলা রেখে বিচক্ষণতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে শত্রুদল ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের কোনো সুযোগ না পায়। [অনুবাদক]

বাস্তবতা হচ্ছে, প্লাবনকে মহাপ্লাবনই রুখতে পারে। দ্রুতগামী ধারা মোকাবিলার জন্য শক্তিশালী ধারার প্রয়োজন। শাক্তিশালী বাতিলের মোকাবিলা তার চেয়ে শক্তিশালী হক-ই করতে পারে। সহীহ আকীদা এবং মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে আত্মত্যাগ ও কোরবানী পেশ করার আকাঙ্ক্ষা না থাকার কারণে অসাধু আন্দোলনের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হচ্ছে। অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। জালেম শাসকদের আর কেউই পছন্দ করছে না। পরিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট পানি না পেলে অশুদ্ধ ও পঁচা পানি দ্বারাই তৃষ্ণা নিবারণ করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۭ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۝

"যারা কাফের তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমরা যদি এমন (মুমিনদের পরস্পরের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা ও কাফিরদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন) না কর তবে দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।"[১]

৯ ৩ ৪ ৫

---

১. সূরা আনফাল, ৮: ৭৩

অমুসলিমরাষ্ট্রে
ইসলামী জাগরণের রূপরেখা

এখানে ওইসব দেশে ইসলামী জাগরণের রূপরেখা আলোচনা করতে চাই, যেখানে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলমানরা সংখ্যালঘু। মুসলমানদের চতুর্দিকে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা, মিথ্যা অপবাদ এবং ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে আছে। তবে সেখানে ক্ষমতায় রয়েছে জাতীয়তাবাদি গণতান্ত্রিক সরকার এবং সেখানে দীর্ঘকাল ধরে ইসলামী জাগরণকামী ধারা অব্যাহত আছে। মুসলিম দেশগুলোর ইসলামী জাগরণকামী আন্দোলনসমূহের তুলনায় তারা কম শক্তিশালী নন।

প্রথম মূলনীতি

ইসলামের আদর্শিক ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব

অমুসলিম সংখ্যাগুরু দেশগুলোতে সকল মুসলমান সাধারণভাবে এবং ইসলামের দায়ীগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন– যথাসম্ভব ইসলামের আদর্শিক ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। নিজেকে ইসলামের নমুনাস্বরূপ পেশ করতে হবে। অমুসলিম ভাইদের মাঝে ইসলামের সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে এটা সবচেয়ে শক্তিশালী ও সর্বোত্তম পন্থা। এর মাধ্যমে অমুসলিম ভ্রাতাগণ ইসলামের মৌলিক বিষয় ও ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবেন এবং কুরআন মাজীদ, রসূল চরিত ও ইসলামী শরীআতের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। যেসব ইসলামী শিক্ষার কারণে মুসলমানরা উৎকৃষ্ট ও আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী এবং যে ভিন্ন রঙে রঙিন তা অমুসলিম ভাইদেরকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে।

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, মুসলমানরা কয়েক যুগ ধরে ইসলামী চরিত্র থেকে বহুদূরে সরে গেছে। তারা অমুসলিমদের রীতি-নীতি, অভ্যাস-রচিত্র ও আঞ্চলিক পুরনো সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। তারা পশ্চিমাবিশ্বের কৃষ্টি-কালচার অবলম্বন করে চলেছে।

মূলত অমুসলিমদের জন্যে এটা সহজ বা সম্ভব নয় যে, তারা মসজিদ বা মাদরাসায় গিয়ে মুসলমানদের চরিত্র অধ্যয়ন করবে। বরং তারা বাজার-ঘাটে, অফিস-আদালতে, সাধারণ মাহফিল ও অনুষ্ঠানে মুসলমানদেরকে দেখেই তাদের সম্পর্কে ভালো-মন্দ মত প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

দ্বিতীয় মূলনীতি

শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে পরস্পরে সহযোগিতা জরুরি

অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে মুসলমানদের দ্বিতীয় করণীয় হচ্ছে, তারা শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। পরস্পরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। ফলে পরস্পরে সম্মানবোধ ও বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হবে এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর বিপরীত হলে মসজিদ-মাদরাসাসহ সকল ইসলামী প্রতিষ্ঠান আশঙ্কায় থাকবে। যেকোনো মুহূর্তে অমুসলিমদের হীনমন্যতা ও সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে ধ্বংস হতে পারে।[১]

অনুরূপভাবে পরস্পরে সম্মানবোধের মাধ্যমে সমাজে মুসলমানদের জন্যে নিজেদের ইসলামী পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। তারা ইসলামী শরীআতের বিধানমতে জীবন যাপন করতে পারবে। নিজেদের

---

১. যেমনটি ঘটছে মায়ানমারে। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হীনমন্যতার শিকার হয়ে হাজার হাজার রুহিঙ্গা মুসলমান শহীদ হয়েছে এবং অসংখ্য মুসলমান আশপাশের দেশগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। অপরদিকে মায়ানমারে ২০১৩ সালের মুসলিম-বৌদ্ধ দাঙ্গার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রবেশকারী শরণার্থীদের বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়নি বাংলাদেশ সরকার। বরং তাদেরকে তাদের দেশেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে, মায়ানমারে এরূপ ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটা সত্ত্বেও ওআইসিসহ কোনো মুসলিম দেশ মায়ানমারের সাথে কূননৈতিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

এসব মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকা জরুরী। তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে (হিন্দুস্তানের 'মানবতার পয়গাম'র মতো) সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজন। এ সংগঠন মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে। মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের হিকমত শিক্ষা দিবে এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক ও বিভিন্ন ধরণের সেমিনারের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা অমুসলিমদের মাঝে তুলে ধরবে। আল্লাহ চাহে তো এর মাধ্যমে মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে পরস্পরে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মুসলমানরা সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারবে। আর যদি তারা নিজেদেরকে আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে আইডিয়াল হিসেবে পেশ করতে পারে তাহলে হয়তো সংখ্যাগুরুর অবস্থান অর্জিত হয়ে সেখানকার শাসনব্যবস্থাও লাভ হতে পারে।

পারিবারিক আইন ও বংশীয় ব্যবস্থাপনা রক্ষা করতে পারবে। নতুন প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। সন্তানদেরকে এরূপ ইসলামী শিক্ষা দেয়া উচিত, যাতে মাতা-পিতার মনোতুষ্টি অর্জন হয়। যেরূপ মনোতুষ্টি অর্জিত হয়েছিল হযরত ইয়াকুব আ. এর। তিনি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘‘مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِیْ’’ আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সকলে এককণ্ঠে উত্তর দিলেন:

نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

“আমরা আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদত করবো। তিনি একক উপাস্য। আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ।”[১]

তৃতীয় মূলনীতি

সামাজিক বিপর্যয় সংশোধনের দায়িত্ব পালন

অমুসলিম সংখ্যাগুরু দেশগুলোতে মুসলমানদের তৃতীয় করণীয় হচ্ছে, তারা সামাজিক বিপর্যয় সংশোধনের দায়িত্ব পালন করবে। চারিত্রিক অবক্ষয় রোধ করবে। পবিত্র জীবন যাপন ও সম্মানবোধের দাওয়াত দিবে। দেশ ও সমাজ যে চারিত্রিক অবক্ষয় ও সম্মিলিত আত্মহত্যার দিকে ধাবিত তা থেকে রক্ষা করার যথাযথ চেষ্টা করবে। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় যে, একটি সমাজ ধন-সম্পদ ও জৈবিক চাহিদার পুজা করার কারণে, লোভ-লালসা ও স্বার্থন্বেষীর কারণে, সুদ-ঘুষ, খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ডুবে যাবে অথচ সে সমাজে বিপুল সংখ্যক মুসলিম নাগরিক রয়েছে। অসংখ্য আলেম-উলামা ও মসজিদ-মাদরাসা থাকা সত্ত্বেও কোনো সমাজে এরূপ অপকর্ম মেনে নেয়া যায় না। এটা বড়ই চিন্তার বিষয়! কেননা মুসলমানদের কাছে দ্বীনী শিক্ষা, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামের চরিতরূপে আদর্শিক চরিত্রের উপকরণ রয়েছে, যা চিন্তাধারার ভ্রান্তি ও চারিত্রিক অবক্ষয় দূর করতে এবং দেশ ও সমাজকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পুরোপুরি সক্ষম।

---

১. সূরা বাকারা, ২: ১৩৩

মুসলমানরা এভাবেই তাদের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর উক্ত পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে দেশবাসীরা মুসলমানদেরকে সম্মান দিতে বাধ্য। তাদেরকে নয়নমণিরূপে গ্রহণ করে অন্তরে জায়গা দিবে। এমনও হতে পারে এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেদেশের নেতৃত্ব দান করবেন। চারিত্রিক নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্বের ময়দানটি এখনও শূণ্য রয়েছে। এটা মুসলমানদের জন্যে মোক্ষম সুযোগ! তারা নিজেদের উত্তম যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণের দ্বারা রাষ্ট্রের নেতৃত্বও অর্জন করে নিতে পারে।

চতুর্থ মূলনীতি

গণতন্ত্রচর্চা ও আইনের সঠিক জ্ঞান

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা আত্মবিশ্বাস, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে নাগরিক ও গনতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করবে। কেননা তারাও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল সন্তান। তারাও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ওইসব সুযোগ-সুবিধা পাবে, যা সংখ্যাগুরুরা পেয়ে থাকে। তাদের জন্যে নিজেদের অধিকার ও মান-মর্যাদা রক্ষা করার, নিজেদের দ্বীন ও মাযহাব অনুযায়ী জীবন যাপন করার এবং দ্বীনকে অন্যদের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার সুযোগ থাকবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো সংবিধান ও নতুন আইন প্রণয়নের প্রতি বিচক্ষণ দৃষ্টি রাখা। পর্যবেক্ষণ করা এবং রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নির্বাচনে নিজেদের সঠিক রায় (Vote) পেশ করা। অবহেলার কারণে বিপদাপদ ও কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়ে যেন দ্বীন ও শরীআহ বিরোধী আইন মেনে নিতে না হয়। বরং তাদের সামনে মিসরের বিজেতা হযরত আমর ইবনুল 'আস র. এর অসিয়ত থাকা উচিত, যা তিনি মিসরবাসীর উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

أنتم في رباط دائم لتشوّف القلوب إليكم

"তোমরা সর্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছ। কেননা তোমাদের শত্রুদের মন-মস্তিষ্ক তোমাদের পেছনে লেগেই আছে।"

পঞ্চম মূলনীতি

নতুন প্রজন্মের শিক্ষা-দীক্ষা ও ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ

মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের জন্যে সঠিক ও মজবুত ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। তাওহীদ তথা একত্ববাদের আকীদা যেন তাদের

পরিচয় এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্যকারী হয়। তাওহীদের আকীদা নতুন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্কে দৃঢ় করার দায়িত্ব পিতা-মাতার। অভিভাবকগণ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা, স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং গণমাধ্যমগুলোর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও দ্বীনী সম্ভ্রমবোধের আলোকে গভীর পর্যবেক্ষণ করবেন। কারণ এসব জিনিস শিশু ও যুবকদের আকীদায় প্রভাব ফেলে থাকে। শুধু বাচ্চারা নয় বরং শিক্ষিত নারী-পুরুষদের আকীদাও দুর্বল করে ফেলে। এমনকি অনেক সময় এসব জিনিসের মধ্যে দ্বীনের বিরুদ্ধে আহ্বান থাকে। আর তা করা হয় জাতীয়তাবোধ ও সংস্কৃতিচর্চার নামে। যেমন হিন্দুস্তানে পৌরাণিক গল্প বা হিন্দু দেওমালা (Mythology) পুনরায় চালু করার চেষ্টা চলছে। এসব গণমাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানের মোকাবিলা করা মুসলমানদের দায়িত্ব। সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার তাদের ব্যবহার করা উচিত। সংবিধানে চিন্তাধারার স্বাধীনতা, নিজ নিজ আকীদা ও দ্বীন পালনের অধিকার এবং সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধান রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে সমান মর্যাদা প্রদান করে এবং প্রত্যেককে নিজ ধর্মবিশ্বাস ও ইচ্ছানুযায়ী নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করে। বর্তমান গণমাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাব থেকে যুবক-বৃদ্ধ ও নারী-পুরুষদের বাঁচাতে হবে। তাদের আত্মার জন্যে উত্তম খোরাক, উপযুক্ত চিকিৎসা ও আকর্ষণীয় সাহিত্য পেশ করতে হবে এবং তাদের অন্তরে নিহিত দ্বীনী সম্ভ্রমবোধ পুনর্জীবিত করতে হবে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন, "اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ" দ্বীন হলো নসীহত ও কল্যাণকামনা। এ হাদীসের উপর আমল করতঃ আপনাদের খেদমতে কিছু পরামর্শ ও মতামত পেশ করেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতি ও আশঙ্কা অনুধাবন করার এবং তার প্রতিকার গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

[বাস্তবচিত্র ও সতর্কবাণী]

অনুবাদ ও গ্রন্থনা

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

আরেফবিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ও
শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর সংশ্রবপ্রাপ্ত

—— ঃ প্রকাশনায় ঃ ——

বাইতুল কিতাব

১৮/১৩, ব্লক–এইচ, মিরপুর–১, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৫১১ ৯৪২৯৬৫, ০১৭১৪ ৩২৩২৯৬

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১২
দ্বিতীয় প্রকাশ (একত্রে): ফেব্রুয়ারি ২০১৩

পরিবেশনায়

দারুল হাদীস	**মাকতাবাতুয যাকারিয়া**
দোকান নং- ২৪, ইসলামী টাওয়ার	বাসা- ৩২, ব্লক- ডি
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭৩০ ৯৯৫৭৭২	মোবাইল : ০১৭১২ ৯৫৯৫৪১

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أما بعد:

১৪১৭ হিজরীর (১৯৯৭ ঈ.) যিলহজ্ব মাসে 'দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা'র দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 'المعهد العالى للدعوة والفكر الإسلامى' (ইসলামী দাওয়াহ ও গবেষণা অনুষদ) এর নতুন শিক্ষাবর্ষের শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ বিভাগের ছাত্রদের সামনে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, উপকারিতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার জন্যে নদওয়াতুল উলামার সম্মানিত নাযেম (পরিচালক) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.কে অনুরোধ করা হয়। তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনা এবং ইসলামীবিশ্ব ও আরববিশ্বের বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী ভাষণ প্রদান করেন। এতে জ্ঞানচক্ষু খোলার মতো (Eye Opener) কতক ভাবনা ও আশঙ্কার কথা আলোচিত হয়, যা শুধু এ বিভাগের ছাত্রদের, মাদরাসার ফাযিলদের বা দ্বীনের দায়ীদের জন্যই নয় বরং ওই সকল বিবেকবান, জ্ঞানী ও বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল মুসলমানদের জন্যেও উপকারী বটে, যারা মুসলিমবিশ্ব ও মুসলিমসমাজের বর্তমান-ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত। দ্বীনের উপর অবিচল থাকা এবং আরববিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও নেতৃত্ব (Leadership) সম্পর্কে অনুভূতিশীল। এসব গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ভাষণটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে, যাতে গবেষকরা অধিক উপকৃত হতে পারেন।

ওয়াযিহ রশীদ নদভী
পরিচালক, 'মা'হাদুল আলী লিদ্‌দাওয়াহ
ওয়াল ফিকরিল ইসলামী'
সম্পাদক, 'আর-রায়িদ' [মাসিক আরবী পত্রিকা]

আলেমদের সচেতন হওয়া জরুরি

'নদওয়াতুল উলমা'র একজন খাদেম ও দায়িত্বশীল হিসেবে আমি আনন্দিত। 'ইসলামী দাওয়াহ ও গবেষণা অনুষদ' দ্বীনী দাওয়াত ও ইসলাম প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ১৩৯৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'নদওয়াতুল উলামা'র যেসব ফাযিল এখানে ভর্তি হয়েছেন তাদের জন্যে আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে, তারা দ্বীন ও মাযহাব সম্পর্কে অতি আস্থাশীল হবেন এবং অন্যদেরকেও আস্থাশীল করতে সচেষ্ট থাকবেন। বর্তমান যুগের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও এর কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিমাবিশ্বকে[১] বুঝবেন। আমেরিকা ও ইসরাইল ভালো করে জানে যে, তাদের ধ্যান-ধারণা, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বশাসনের পরিকল্পনা একমাত্র প্রভাবশালী মুসলমান ও মুসলমানদের ঐক্যই চ্যালেঞ্জ করতে বা প্রতিহত করতে পারে। বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থায় এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরি এবং নদওয়াতুল উলামার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা 'নদওয়াতুল উলামা'র প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. খ্রিস্টান মিশনারির সাথে বিতর্ককালে অনুভব করেছিলেন, উলামাসমাজকে বর্তমান যুগের ইসলাম বিরোধী নতুন আশঙ্কা সম্পর্কে অবগত থাকা জরুরি। বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে তুলনামূলক অধ্যয়ন (Comparative Study) করতে হবে। তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের (যারা সাধারণত চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অধিকারী হন) মন-মস্তিষ্ক থেকে হীনমন্যতা দূর করার যোগ্যতা থাকা চাই। তাদের মধ্যে ইসলামের চিরন্তন হওয়ার বিশ্বাস, প্রত্যেক যুগে ইসলামের প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতা, শুধু ইসলামই মানবতার মুক্তি ও সফলতার দিশা হওয়ার বিশ্বাস এবং তা অন্যদেরকে বোঝানোর যোগ্যতা থাকা চাই। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এ ধরণের দাওয়াত ও প্রশিক্ষণীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান যুগের দাবি ও সময়ের একান্ত প্রয়োজন এবং 'নদওয়াতুল উলামা' প্রতিষ্ঠাতাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন।

---

১. সাধারণভাবে যদিও গোটা পশ্চিমাবিশ্বকে ইসলাম বিরোধী এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ভাবা হয়, তবে এর মূল হোতা ইহুদী বা ইসরাইল। তারাই পশ্চিমা শক্তির কেন্দ্রবিন্দু আমেরিকাকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করে আসছে।

ইসলামই একমাত্র শ্বাশ্বত দ্বীন

ইসলামই একমাত্র শ্বাশ্বত দ্বীন। ‘আল্লাহ তা‘আলার নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম’[১] এ ঘোষণা সর্বকালের জন্যে। তদ্রূপ আল্লাহ তা‘আলার বিধি-নিষেধও চিরকালের জন্যে। অর্থাৎ দ্বীন চিরস্থায়ী ও চিরসত্য একটি বিষয়, যা যুগের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত নয়। তবে সময় স্থির ও স্থিতিশীল নয়, বরং প্রগতিশীল। পরিবর্তনশীল বলেই সময়কে সময় বলা হয়। সময় পরিবর্তনশীল, সময়ের প্রবণতা পরিবর্তনশীল এবং সময়ের দাবি ও প্রভাবও পরিবর্তনশীল। সময়ের ধারার সাথে সাথে আন্দোলন বদলাতে থাকে। প্রত্যেক যুগেই বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন জন্ম নেয় এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করা হয়। নতুন নতুন সরকার গঠিত হয়। তাদের দাবি ও স্বার্থ পরিবর্তন হতে থাকে। তাদের রাজনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক স্বার্থ থাকে। এ জাতীয় সরকারগুলো তাদের সমর্থক দল তৈরি করতে চায় এবং চায় জনসাধারণ যেন সরকারি ব্যবস্থাপনা ও সরকারি কর্মকর্তাদের সংস্কৃতি এমনকি তাদের সামাজিক রীতিনীতিও আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করে। এজন্য তারা নিত্যনতুন কৌশল আবিষ্কার করতে থাকে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে এর প্রচলন অনেক বেশি।

ইসলামের বিরুদ্ধে দুটি মারাত্মক আক্রমণ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা হয়েছিল তা সবই নস্যাৎ করে দেয়া হয়। তবে ইসলাম ও মুসলিমবিশ্বের জন্যে দুটি বিপদ মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এর ফলে ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এর আন্তর্জাতিক প্রভাব ও রাজনৈতিক শক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর ইসলাম একটি আঞ্চলিক অথবা বিশেষ জাতি বা সাম্প্রদায়ের ধর্ম হিসেবে নতুন পরিচয় লাভ করবে। এক, খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের আক্রমণ, যা পঞ্চম হিজরী শতাব্দী মোতাবেক একাদশ ঈসায়ী শতাব্দীতে হয়েছিল। দুই, তাতারিদের আক্রমণ, যা সপ্তম হিজরী শতাব্দী মোতাবেক ত্রয়োদশ ঈসায়ী শতাব্দীতে চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের নেতৃত্বে হয়েছিল।

---

১. সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯

ক্রুসেডারদের আক্রমণ

ক্রুসেডাররা সিরিয়ায় আক্রমণ করে। বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। মক্কা-মদীনা দখল করার পরিকল্পনাও ছিল তাদের। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সালাউদ্দীন আইয়ুবীকে দাঁড় করালেন। তার মধ্যে ছিল অধিক তাকওয়া, জিহাদের অনুরাগ, সাহস ও ইসলামের প্রতি বিরল সম্মানবোধ। তিনিই ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করেন। মুসলমানরা তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করার ফলে এ বিপদ কেটে যায়।

ক্রুসেডার এবং তাতারি আক্রমণ ততটা ভয়ানক ছিল না যতটা ...

সেযুগে ইউরোপ[১] ও আক্রমণকারী খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহে সংস্কৃতির এত উন্নতি হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানও পরবর্তী শতাব্দীর ন্যায় এতটা বিস্তার লাভ করেনি। আর তাদের সামনে পৃথিবীকে নতুনভাবে বিন্যাস করার ও সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের নীল নকশা ছিল না, যা পরবর্তীকালে পশ্চিমা বিজেতা (Conqueror) ও উপনিবেশবাদী (Colonialist) শক্তিদের প্লান-পরিকল্পনায় যোগ হয়েছে। এটা ছিল সামরিক আক্রমণ ও পবিত্র স্থানসমূহ দখলের একটি অপপ্রয়াস মাত্র। এ দ্বারা ততটা আশঙ্কা ছিল না যতটা আশঙ্কা তার কয়েক শতাব্দী পর ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রাচ্যের দেশগুলোর পশ্চিমাবিশ্বের দাসত্ব গ্রহণ ও উপনিবেশিকতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পর সৃষ্টি হয়েছে।[২]

---

১. তখন ইউরোপ জাহেলী যুগে বা অন্ধকার যুগে (Dark Ages) বিচরণ করছিল। তারা হয়তো তখন শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার নাম পর্যন্ত শোনেনি। পরবর্তীকালে মুসলমানদের থেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও দর্শন শিখে উস্তাদের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়ে উঠে। কিন্তু ইউরোপ বোধ হয় ভুলে বসেছে যে, "উস্তাদের মার শেষ রাতে।"

২. ক্রুসেডাররা সিরিয়ায় প্রথমবার ৪৯০ হিজরীতে আক্রমণ করে এবং ৪৯২ হিজরী মোতাবেক একাদশ শতাব্দী অর্থাৎ ১০৯৯ ঈ. সনের শেষের দিকে বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে। তাদের সীমালঙ্ঘন, জুলুম-নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত আলোচনা 'ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' ৬ষ্ঠ খণ্ডে দেখুন। দারে আরাফাত, রায় বেরেলভী থেকে প্রকাশিত অধমের আরবী পুস্তিকা

কুরকের শাসক রিজনাল্ড (Reginald) মক্কা-মদীনার উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ লেনপোল (Lane Poole) বলেন, বাদশাহ ইমাদুদ্দীন জঙ্গী রিজনাল্ডের মোকাবিলা আরম্ভ করেন এবং যুদ্ধ সমাপ্ত হয় তাঁর পুত্র ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নূরুদ্দীন জঙ্গীর মাধ্যমে। তবে এ মিশনে পুরোপুরি সফলতা অর্জিত হয় সিরিয়ার বাদশাহ নূরুদ্দীন জঙ্গীর সেনাপ্রধান সালাউদ্দীন আইয়ুবীর মাধ্যমে। মিসরের রাজত্ব ছিল সালাউদ্দীন আইয়ুবীর দখলে। তিনিই বাইতুল মুকাদ্দাসকে খ্রিস্টানদের কবল থেকে দখলমুক্ত করেন। তাঁর অন্তর ছিল জিহাদের জযবায় পরিপূর্ণ। ছিল দ্বীনের অনুকরণ ও ইসলামের প্রতি বিরল সম্মানবোধ। তিনি ৫৮৩ হি. মোতাবেক ১১৮৭ ঈ. সনে 'হিত্তীন'র যুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের নীল নকশা নশ্বর করে দেন।[১] হিত্তীনের চূড়ান্ত যুদ্ধে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা পরাজিত হয় এবং মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাস ফিরে পায়। সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবী ২৮ সফর ৫৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

বর্তমান ইউরোপের ক্ষতির দিক

দ্বাদশ খ্রিস্ট শতাব্দীতে ইউরোপের খ্রিস্টান দেশগুলো শিক্ষা-দীক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার, অস্ত্রশিল্প, উপনিবেশীয় পরিকল্পনা (Colonical Policy) এবং ধর্মহীন প্লানের প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ওই স্থানে পৌঁছতে পারেনি যে স্থানে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেছে। তখন তাদের আক্রমণ ও বিজয় দ্বারা শুধু খ্রিস্টবাদের প্রচার-প্রসার, পবিত্র স্থানসমূহ দখল এবং মুসলমানদেরকে রাজনৈতিভাবে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য ছিল। পক্ষান্তরে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে (বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে) এবং মুসলিমবিশ্বে তাদের

'صلاح الدين الأيوبي البطل الناصر لدين الله' অধ্যয়ন করুন। উর্দুতে অধমের লেখা 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) ১ম খণ্ড ৩০৩-৩৩৪ পৃষ্ঠায় তাতারিদের আক্রমণ, জুলুম-নির্যাতন, মুসলিমবিশ্বের কেন্দ্রীয় শহরগুলি বিশেষ করে বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে এবং তাতারিদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের তথ্যাবলীর স্ববিস্তার আলোচনা দেখুন। দানেশগাহে পাঞ্জাব, লাহোর থেকে প্রকাশিত 'উর্দু দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়া' ৭ম খণ্ডে ৬৯১-৭২৪ পৃষ্ঠায় 'চেঙ্গিস খান' শিরোনামে তাতারি আক্রমণ, জুলুম-নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১. বিস্তারিত দেখুন, লেনপোল রচিত 'সুলতান সালাউদ্দীন' পৃ. ১৫৫

সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাদের ধর্মহীন সংস্কৃতিকে উন্নতি ও সভ্যতার প্রতীক বলে প্রচার করা হয়। এ দ্বারা ইসলাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এর বিপরীতে তাতারিদের আক্রমণ ছিল একটি সামরিক আক্রমণ মাত্র। তবে অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, সফল আক্রমণকারী ও সামরিক বিজেতা শুধু সামরিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তার চিন্তাধারা-আকীদা, কার্যপদ্ধতি ও জীবনধারা পরাজিতদেরকে প্রভাবিত করে থাকে। তাতারিদের বিজয় দ্বারা মুসলমানদের দাসে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা ছিল মাত্র। তাতারিরা অগাধ নির্যাতন চালায়। মুসলমানদেরকে শহীদ করে 'দজলা' নদীতে লাশ ফেলে দিত। ফলে মুসলমানদের রক্তে নদীর পানি পর্যন্ত রঙিন হয়ে যেত। আবার কখনও বড় বড় লাইব্রেরীর (বিশেষ করে বাগদাদের) কিতাবাদি নদীতে নিক্ষেপের কারণে নদীর পানি কালো বর্ণে পরিণত হতো। তারা মুসলমান শহীদদের মাথা দিয়ে মিনার তৈরি করেছিল। এসব মিনার দূর-দূরান্ত থেকেই দেখা যেত। একের উপর এক মাথা রাখা সম্ভব ছিল না। তাই মাথার একটি স্তুপের উপর আরেকটি স্তুপ রেখে মিনার তৈরি করেছিল। তাদের জুলুম-নির্যাতনের অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, ''إذا قيل لك أن التّتر انهزموا فلا تصدق'' – তোমাকে কেউ তাতারিদের পরাজয়ের কথা বললে বিশ্বাস করো না।

তাতারিদের কোনো সংস্কৃতি ছিল না

তাতারি আক্রমণের বিশেষ দিক হচ্ছে, অন্যদেরকে প্রভাবিত করার মতো তাদের কোনো সংস্কৃতি (Culture) ছিল না। ছিল না কোনো দাওয়াত বা মতবাদ। সুতরাং তাদের আক্রমণ সফল হলেও বেশিদিন টিকে না থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা তাতারিদের জন্যে নিজ রহমত ও কুদরত প্রকাশ করলেন। মুসলমান উলামায়ে কেরাম ও শরীআহসিদ্ধগণ তাতারিদের নিকট ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামের ন্যায়পরায়ণ আইনের পরিচয় তুলে ধরলেন। এ দ্বারা তাতারিদের জীবনধারায় বিদ্যমান জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি-সভ্যতা ও দাওয়াতের শূন্যতা পূরণ হয়ে যায়। মূলত এ ধরণের বিজয় ও বিপ্লবে বিদ্যমান ঘাটতি বেশিদিন থাকে না। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, কমতি পূরণ হবেই। তাতারিদের

মধ্যে নীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষা এবং বিশ্ববাসীর কল্যাণার্থে কোনো দাওয়াত ছিল না। তাতারিদের এ কমতি মুসলমান চিন্তাবিদ, জ্ঞানী ও বিশ্লেষকরা দাওয়াতের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তারা তাতারিদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন যে, তোমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এ ঘাটতি একমাত্র ইসলামই পূরণ করতে পারে। ইসলামে রয়েছে বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ববাসীর জন্যে কল্যাণমূলক দাওয়াত। তাতারিদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের কাজে আউলিয়া ও বুজুর্গানে কেরাম নজিরবিহীন ভূমিকা রেখেছেন। এ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ও প্রভাব বিস্তারকারী একটি ঘটনার বর্ণনা সমীচীন মনে করছি।

তাতারিরা যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করে

প্রফেসর আরনাল্ড 'প্রিচিং অফ ইসলাম' (Preaching of Islam) গ্রন্থে লিখেন, তাতারিদের যে শাখা ইরান ও তুর্কিস্তান দখল করেছিল তাদের শতভাগ ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হচ্ছে, যুবরাজ তুঘলক তায়মুর একদিন শিকার করতে বের হন। শিকারীদের মধ্যে সফলতা ও ব্যর্থতার বিভিন্ন কুসংস্কার থাকে। যেমন- আমরা ছোটবেলায় শুনেছি বৃহস্পতিবার শিকার পাওয়া যায় না। শিকারে যাত্রাকালে চাকুর কথা জিজ্ঞেস করলে শিকার পাওয়া যায় না ইত্যাদি। তদ্রূপ তাতারিদের মধ্যে ইরান ও ইরানীদের সম্পর্কে কুসংস্কার ছিল যে, ইরানীরা অশুভ ও অলক্ষ্মী জাতি।[১] তুঘলক তায়মুর শিকারের পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সমুদ্রের তীরে সকল জায়গায় ও সকল প্রবেশপথে প্রহরী নিযুক্ত করেন, যাতে তার শিকার খেলার এলাকায় কোনো ইরানী প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ছিল অন্যরকম। আল্লাহ্ তা'আলা তাতারিদের মতো যুদ্ধপ্রিয়, শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী জাতিকে মুসলমান বানিয়ে তাদের দ্বারা দ্বীন প্রতিরক্ষার কাজ নিতে চেয়েছেন। কাজেই এটা আল্লাহ তা'আলার একটি কৌশল ছিল মাত্র। শায়খ জামালুদ্দীন আফগানী রহ. নামক এক ইরানী বুজুর্গ এ পথেই কোনো সফরে যাচ্ছিলেন। যখন ওই শিকারের জায়গায় পৌঁছেন আল্লাহর কুদরতে তাঁর পথে কোনো প্রহরী ছিল না। তিনি

১. বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে এ জাতীয় কুসংস্কার সর্বকালেই থাকে।

সামনে এগিয়ে গেলে এক প্রহরী দেখে ফেলে এবং আটক করে যুবরাজের নিকট নিয়ে যায়। তাঁকে দেখামাত্র যুবরাজ তায়মুর রেগে যান আর মনে মনে বলেন, শিকারের সব আয়োজন বুঝি ভেস্তে গেল। এখন আর কোনো শিকার পাওয়া যাবে না। তাই রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, "তোমরা ইরানীরা ভালো, না কুকুর? উভয়ের মধ্যে উত্তম কে?" প্রফেসর আরনাল্ড লিখেছেন, শায়খ জামালুদ্দীন আফগানী রহ. উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে ও আমার জাতিকে ইসলাম নামক সম্পদ না দিতেন তাহলে কুকুর আমাদের চেয়ে উত্তম হতো। কিন্তু যেহেতু আমাদেরকে ইসলাম দিয়েছেন, সুতরাং আমরা ইরানীরা কুকুরের চেয়ে উত্তম। তায়মুর জিজ্ঞেস করেন, ইসলাম কী জিনিস? হযরত আফগানী রহ. সাহসী ও বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি ইসলামের সংক্ষিপ্ত এবং প্রভাব বিস্তাকারী পরিচয় তুলে ধরেন। এতে তায়মুরের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়। যুবরাজ বলেন, আমি এখন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলে এতে কোনো উপকার হবে না। বরং আমাকে যখন তাজ পরানো হবে তখন এসে দেখা করবেন। তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দিব।

ঘটনাটি মূল উৎসের আলোকে

প্রফেসর আরনাল্ড ঘটনাটি এভাবেই লিখেছেন। তবে তুর্কি ও ফারসি তথা মূল উৎসে ঘটনাটি আরও উত্তমরূপে বর্ণিত হয়েছে। যুবরাজ তায়মুর হযরত আফগানী রহ.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি উত্তম না এ কুকুরটি উত্তম? হযরত আফগানী রহ. বললেন, এখন এর ফয়সালা করা সম্ভব নয়। তায়মুর বললেন, এখন ফয়সালা করা যাবে না কেন? এ হচ্ছে কুকুর, আর এই আপনি! হয় বলেন কুকুরটি উত্তম, না হয় বলেন আপনি উত্তম! হযরত আফগানী রহ. বললেন, আমি যদি কালেমা পাঠরত অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নিই অর্থাৎ যদি ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমি উত্তম। অন্যথায় কুকুরটি উত্তম। উত্তর শুনে যুবরাজের মন-মস্তিষ্ক কেঁপে উঠে। তিনি বললেন, আমাকে শাহী তাজ পরিধান করানোর সংবাদ শুনে আমার সাথে দেখা করবেন। তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। হযরত আফগানী রহ. দিন গুণতে থাকেন আর তায়মুরের তাজ পরিধান করার সুসংবাদ শোনতে কান পেতে থাকেন। কিন্তু হযরত আফগানীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে

আসে। তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস! সম্ভবত এ সৌভাগ্য তোমার ভাগ্যে আছে। তুমি যখন তুঘলক তায়মুরকে তাজ পরানোর সংবাদ শোনবে তখন তার সাথে দেখা করে ওই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেবে। অতএব হযরত আফগানী রহ. এর ছেলে তায়মুরের তাজ পরিধানের সংবাদ শুনে তার সাথে সাক্ষাত করতে যান। প্রহরী তাকে শাহী মহলে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। তাই শাহী মহলের বাইরে জায়নামায বিছিয়ে জোরে জোরে আযান দিয়ে নামায পড়তে থাকেন। দিনের বেলায় তার আযানের শব্দ বাদশাহর কানে পৌঁছেনি। ফজরের সময় আযানের শব্দ শুনে বাদশাহ তায়মুর বললেন, এ কিসের শব্দ? কে এ সময় চেঁচামেচি করে মানুষের ঘুম নষ্ট করছে? তাঁকে বলা হয়, শাহী মহলের বাইরে এক লোক উঠাবসা করে আর এভাবে শব্দ করে। বাদশাহ বললেন, তাকে ধরে নিয়ে এসো! প্রহরীরা তাকে ধরে বাদশাহর কাছে নিয়ে যায়। তিনি বললেন, আমি হযরত আফগানী রহ. এর ছেলে। আমার পিতাকে আপনি প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি উত্তম, না কুকুর?" আমি আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি যে, আমার আব্বা ঈমানের সাথে কালেমা পাঠরত অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বাদশাহ তায়মুর ওয়াদা মাফিক কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন এবং মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী বললেন, আমি তো বহু আগেই মুসলমান হয়েছি। যখন আমি ইরান গিয়েছিলাম সেখানে ইসলাম গ্রহণ করি। কিন্তু আপনার ভয়ে প্রকাশ করিনি। এরপর তাতারিদের পুরো ইরানী শাখা মুসলমান হয়ে যায়। আস্তে আস্তে তাতারিদের অন্যান্য শাখায়ও ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

একজন বিজ্ঞ ইতিহাসবিদ বলেছেন, আরব ও তুর্ক দুটি এমন জাতি, যাদের শতভাগ মুসলমান হয়েছিল। একজন সফল দায়ীর কর্তব্য হচ্ছে, আহ্বানকৃত জাতির মেজাজ বোঝা, হিকমত ও কৌশলের সাথে দাওয়াত দেয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

"আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।"[১]

---

১. সূরা নাহল, ১৬: ১২৫

কিন্তু বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা ও আশঙ্কা হচ্ছে, ইহুদী জাতি এবং সমস্ত খ্রিস্টানবিশ্ব এ বিষয়ে স্বচেষ্ট যে, ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে দ্বীনী সম্ভ্রমবোধ ও দ্বীনদার হওয়ার গর্ব শেষ হয়ে যাক। ঈমান শেষ হয়ে যাক। আর ঈমান ও বিশ্বাসের পরিবর্তে হীনমন্যতার সৃষ্টি হোক।

প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যবিদ

প্রাচ্যবিদ্যা (Orientalism) ও প্রাচ্যবিদ (Orientalist) সম্পর্কে 'দারুল মুসান্নিফীনে' অনুষ্ঠিত সেমিনারে আমি বলেছিলাম, পশ্চিমা শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ তাদের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সঠিক অনুধাবন করেছে যে, কোনো দেশকে অনুগত ও চিরস্থায়ী গোলাম বানানোর জন্যে শুধু সামরিক হামলা, রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন, আধুনিক অস্ত্র এবং যুদ্ধ যথেষ্ট নয়। বরং সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণী ও সুশীল সমাজকে ভীত ও হীনমনস্ক করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা প্রাচ্যবিদ (Orientalist) তৈয়ার করেছে। এ রহস্য অনেক কম লোকের জানা যে, প্রাচ্যবিদরা নিজেদের শখে ও জ্ঞান অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়ে গবেষণা বা রচনার কাজ করে না। জ্ঞানতৃষ্ণা থাকলেও তা নগণ্য। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যার আড়ালে রাজনৈতিক ও উপনিবেশবাদী শক্তি স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে।[১] প্রাচ্যবিদ্যা (استشراق) বর্তমান যুগের বড় সমস্যা। এ সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু, হাতিয়ার এবং প্রাচ্যবিদদেরকে হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহারকারীদেরকে চিহ্নিত করা অতীব জরুরি।

পশ্চিমা সরকারগুলো প্রাচ্যবিদদের পৃষ্ঠপোষকতা করে

ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রাচ্যবিদদের (مستشرقين) একটি দল রয়েছে। সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। তারা তাদের মেধা ও যোগ্যতা এমন বই লিখায় ব্যয় করেছে, যার মধ্যে ইশারা-ইঙ্গিতে ইসলামের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। কারণ তারা বোঝে সরাসরি ইসলামের উপর

---

১. 'দারুল মুসাননিফীনে' অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যবিদ সম্পর্কে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছিল তা 'الإسلام والمستشرقون' নামে আরবীতে এবং 'اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین' নামে উর্দুতে 'মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আক্রমণ করা হলে তাদের বিরোধী এক শক্তি সৃষ্টি হবে। এসব বই লিখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠকদের মধ্যে কুরআন-হাদীস, ফিকহ, ইসলামী দর্শন ও মুসলমানদের সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে হীনমন্যতা ও সন্দেহ সৃষ্টি করা। এসব বইয়ে কৌশল ও প্রতারণার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে খোড়া যুক্তি দাঁড় করা হয়েছে, যা পড়ে পাঠক মনে করে, আমরা তো খুব নিম্নমানের জীবন যাপন করছি। আমাদের উলামাসমাজ ও লেখকবৃন্দ ইসলামের এসব দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলাম আবির্ভাবের বহু পরে হাদীস সংকলিত হয়েছে। অনেক দেরিতে ইসলামী আইন প্রণীত হয়েছে। প্রাচ্যবিদরা এ জাতীয় খোড়া যুক্তি পেশ করে থাকে। অথচ এ বিলম্বের কতক হিকমত ছিল। হাদীস সংলকনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিশেষ রহমত ও সাহায্য ছিল। বরং এটা একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল যে, বুখারা ও তুর্কিস্তানের মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী কয়েকজন ব্যক্তি হাদীস সংকলনের কাজটি হাতে নিলেন। তাদের তুলনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যা ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনচরিতে পাওয়া যায়।

ইমাম বুখারীর প্রখর স্মৃতিশক্তির ঘটনা

ইমাম বুখারী রহ. যখন বাগদাদে গেলেন তখন সেখানকার আলেমগণ তাঁকে পরীক্ষা করার এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন যে, একশত হাদীসের সনদ (বর্ণনাধারা) ও মতন (আলোচ্য বিষয়) উলটপালট করে এক হাদীসের সনদ আরেক হাদীসের মতনের সাথে এবং এক হাদীসের মতন আরেক হাদীসের সনদের সাথে জুড়ে দিলেন। দশজন ব্যক্তিকে দশ দশটি হাদীস মুখস্থ করিয়ে ইমাম বুখারীকে প্রশ্ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়। ইমাম বুখারী রহ. যখন মজলিসে উপস্থিত হন তখন একেক ব্যক্তি দশ দশটি হাদীস শুনিয়ে তাঁর মতামত জানতে চায়। তিনি হাদীস শুনে বলতেন, এসব হাদীস আমার জানা নেই। আলেমগণ তো এরূপ উত্তরের রহস্য বুঝতে পারলেন। তবে মূর্খরা উত্তর শুনে হাসতে লাগল। যখন সবাই নিজ নিজ দায়িত্বের হাদীস শুনিয়ে শেষ করল। তখন ইমাম বুখারী রহ. প্রশ্নকারী একেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি যে দশটি হাদীস শুনিয়েছেন তার আসল মতন হচ্ছে এই, আর আসল সনদ এই। এভাবে

সকলের হাদীসগুলি শুদ্ধ করে দিলেন। যেই সনদের যে মতন ও যেই মতনের যে সনদ ছিল তা শুদ্ধভাবে বর্ণনা করলেন। উপস্থিত লোকজন তাঁর দূরদৃষ্টি, উপস্থিত জ্ঞান ও প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হলো।[১]

ফিকহ্ ও ইলমে কালাম সংকলনের কথা

তদ্রূপ ফিকহ সংকলনকালে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত চার ইমাম, তাঁদের বিরল যোগ্যতার অধিকারী ছাত্রবৃন্দ এবং মুজতাহিদীনরূপে যেসব ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন। আইন প্রণয়ন ও জীবনধারার সমস্যাবলী সমাধানে তারা নজিরবিহীন কৃতিত্ব পেশ করেছেন।[২]

তেমনিভাবে যখন গ্রীক দর্শন ইসলামী দেশগুলোতে বিশেষ করে ইরাক ও তার রাজধানী বাগদাদে আত্মপ্রকাশ করে এবং জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাবিদ শ্রেণীকে প্রভাবিত করে। গ্রীক দর্শন নিজ জ্ঞানের গভীরতা ও সূক্ষ্ম যুক্তির মাধ্যমে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী শ্রেণীর আকীদা-বিশ্বাস নড়বড় করে দেয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আবুল হাসান আশাআরী, ইমাম আবু মানসূর মাতুরিদী, ইমাম গাজ্জালী এবং শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. প্রমুখদেরকে সৃষ্টি করেন। তারা মুসলিম সমাজকে গ্রীক দর্শনের ভীতি ও প্রভাব থেকে মুক্ত করেন।

তদ্রূপ ভ্রান্ত আকীদা ও মতবাদ, জাহেলী যুগের কুসংস্কার ও অভ্যাস, শিরক-বিদআত দূর করার লক্ষ্যে; সঠিক দ্বীন ও আকীদা এবং সুন্নাত ও শরীআত প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে যুগে যুগে প্রত্যেক দেশে আউলিয়া, ধর্মসংস্কারক ও দায়ী সৃষ্টি করেছেন। তারা জাহেলী যুগের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক আহ্বান ও দ্বীন-ঈমান ধ্বংসকারী প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে সঠিক দ্বীন প্রচলিত মুদ্রার ন্যায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৩]

---

১. 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' খ. ১, পৃ. ৭৮ (ফাতহুল বারী পৃ. ৪৮৭ থেকে সংগৃহীত)

২. চার মাযহাব এবং ফিকহ ও ইজতিহাদের ইতিহাস ও মূল উৎস (উর্দু)

৩. বিস্তারিত জানতে অধমের রচিত 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' উর্দু (খ. ১-৫) ও 'রিজালুল ফিকরি ওয়াদ্দাওয়াহ ফিল ইসলাম' আরবী (খ. ১-৩) পড়ুন।

ইসলামী মূল্যবোধ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করাই প্রাচ্যবিদ্যার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

প্রাচ্যবিদদের আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা পাশ্চাত্য উপনিবেশীয় শক্তি খুব উপকৃত হয়েছে। এর জলন্ত প্রমাণ হচ্ছে, পশ্চিমা স্বৈরাচারদেরকে তাদের দখলকৃত রাষ্ট্রসমূহ থেকে উৎখাতের পর কিংবা তাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রাচ্যবিদদের গবেষণাকর্ম অলস হয়ে পড়েছে। এটা ঘটনাক্রমে হয়নি। তাদের প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাবও কমেনি। বরং আরও শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যবিদদের কাজের গতি একেবারেই লোপ পেয়েছে। মাঝেমধ্যে দু'একটি বই প্রকাশিত হয়, যার যুক্তিও পূর্বের তুলনায় দুর্বল হয়ে থাকে। প্রাচ্যবিদদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল ইসলামীবিশ্বের শিক্ষিত ও ধার্মিক শ্রেণীর আকীদা-বিশ্বাস দুর্বল ও নড়বড়ে করা। ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামী ইতিহাস, সীরাতুন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, কুরআন-হাদীস এবং ইসলামী ফিকহ ও ইসলামী দর্শন সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সন্দিহান করে তোলা।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের ইসলাম সম্পর্কে হীনমন্যতা

সাম্প্রতিককালের বড় সমস্যা হলো, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে হীনমন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। তারা ইংরেজী ও ফরাসি ভাষায় যেসব বই-পুস্তক পড়ে, তাতে এ জাতীয় বিষয়বস্তু রয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রচলন তুলনামূলক কম। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষ করে ফ্রান্সের দখলকৃত (উত্তর আফ্রিকা, মরক্কো, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও ত্রিপোলি) রাষ্ট্রসমূহে ফরাসি ভাষায় আর অন্যান্য দেশে ইংরেজী ভাষায় এ জাতীয় বই-পুস্তক ছড়িয়ে আছে।

আরববিশ্ব ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশ

সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ও দুঃখজনক বিষয় হলো, আরব দেশগুলো এখন আমেরিকা ও ইসরাইলের মূল টার্গেট। তাদের এ ষড়যন্ত্র অনেকটা

সফলও বটে। সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণী (যারা ক্ষমতাশীন) হীনমন্যতার শিকার হয়েছে। তারা ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত। এক্ষেত্রে মিসর ও আলজেরিয়া এগিয়ে রয়েছে। সেখানকার সরকার ও নেতৃবৃন্দ দ্বীনী দাওয়াত ও আন্দোলন দ্বারা অধিক ভীত। সেখানে সরকারের মূল সংঘাত ইসলামী পুনর্জাগরণের ডাক ও আন্দোলনের সাথে। সরকার ও ইসলামপ্রিয় শ্রেণীর মাঝে রণাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আলজেরিয়া, ত্রিপোলি, মরক্কো ও মিসরে স্বাধীনতার আন্দোলনে উলামায়ে কেরামই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ এসব দেশ দ্বীনী দাওয়াত, ইসলামী নেতৃবৃন্দ ও ইসলামী আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। মিসরে শায়খ হাসানুল বান্নাকে সরকারের জন্য বিপজ্জনক ভেবে শহীদ করা হয়। জামাল আবদুন নাসিরের যুগে সাইয়েদ কুতুবসহ ইসলামী আন্দোলনের বহু নেতা-কর্মী শহীদ করা হয়। মিসর ও আলজেরিয়া সরকার দ্বীনী অভ্যুত্থান এবং "সরকার এটা কেন করছে? এটা ইসলামী শরীআহ বিরোধী কার্যকলাপ।" জাতীয় উক্তি নিজেদের জন্যে সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ মনে করে। তারা ইসরাইল বা অন্য কোনো অমুসলিম শক্তিকে ভয় পায় না। তারা ভয় পায় শুধু দ্বীনী শক্তিকে। এটা খুবই দুঃখজনক। যে ভূখণ্ডে রয়েছে জামি'আ আযহার (Al-Azhar University)। যেখানে আফ্রিকাসহ বহু ইসলামী রাষ্ট্রের হাজার হাজার ছাত্র অধ্যয়নরত। যে জামি'আ আযহারকে ইসলামীবিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গণ্য করা হয়। সেই ভূখণ্ডে দ্বীন সম্পর্কে এমন হীনমন্যতা কাম্য নয়।

আরবদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত বিলুপ্ত প্রায়

বর্তমানের তিক্ত সত্য হচ্ছে, আরববিশ্ব ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপারে মারাত্মকভাবে ভীত। সেখানে কোনো শক্তিশালী আন্দোলন নেই। নেই কোনো আকর্ষণীয় সংগঠন। আরববিশ্বের মাধ্যমে আমরা ঈমান পেয়েছি। কুরআন পেয়েছি। মানবতা পেয়েছি। তারাই আমাদের হেদায়েতপ্রাপ্তির মাধ্যম। কোনো ক্ষমতাধর বা সভ্য জাতির

কিংবা কোনো সংস্কৃতি বা কৃষ্টি-কালচারের আরবদের ন্যায় বিশ্বব্যাপী এত অবদান-অনুগ্রহ নেই। তাদের অবদানেই আজ আমরা মুসলমান ও দায়িত্বশীল মানুষ। বর্তমান সময়ে এ জাতীয় দাওয়াত আরবদের মধ্যে শুধু লোপ পায়নি বরং বিলুপ্তপ্রায়। 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'র আন্দোলনের অশুভ পরিণতির পর সেখানে নীরবতা ছেয়ে আছে। 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'র উপর যেভাবে জুলুম-নির্যাতন হয়েছে তা দেখে সেখানকার সুযোগ্য ও জ্ঞানী লোকেরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে মিসরে এমন এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে যে, 'মুসলিম জাতি পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে' তারা এর কল্পনাও করতে পারত না। সুতরাং আমার আরবী গ্রন্থ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়– এতে ড. আহমাদ আমীনের একটি দুর্বল ভূমিকা লেখা ছিল। এরপর সাইয়েদ কুতুব শহীদ একটি শক্তিশালী ভূমিকা লিখেছেন এবং ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ মূসার ভূমিকাও ছিল।– আমি মিসর গেলে সেখানকার একটি পত্রিকা আমার উক্ত বইয়ের সমালোচনা করে লেখে, "মুসলমানও কি বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করতে পারে? মুসলমানদের উত্থান-পতনে আবার বিশ্বে কী প্রভাব পড়বে? এটা আবার বইয়ের কেমন নাম?" পত্রিকাটির সম্পাদক খুব বেশি বিস্মিত হয়েছিল। অথচ আমি আল্লামা ইকবালের একটি ছন্দ (شعر) থেকে কিতাবটির নাম চয়ন করেছি। ছন্দটি সম্পাদকের এরূপ বিস্ময়ের পরিপূর্ণ উত্তর। ইবলিসের ভাষায়[১] আল্লামা ইকবাল বলেছেন:

ہر نفس ڈرتا ہوں اِس امت کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کے دیں کی احتسابِ کائنات

এ উম্মতের জাগরণে সম্পর্কে আমি প্রতি মুহূর্ত আতঙ্কিত;
যাদের দ্বীনের বৈশিষ্ট্য জগতবাসীর হিসাব নেওয়া।

১. ইবলিসের একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে একেকটি আশঙ্কার কথা বলে। কেউ সমাজতন্ত্রের আশঙ্কা প্রকাশ করে। কেউ সামরিক শক্তি আর কেউ পুঁজিবাদের কথা বলে। ইবলিস বলল এ উম্মতের অভ্যুত্থানের কথা। ইবলিসের অনুভূতি ইবলিসের ভাষায় কবি সম্প্রাট আল্লামা ইকবাল ব্যক্ত করেছেন।

আরবদেরকে ইসলামের প্রতি আস্থাশীল করে তুলতে হবে

মুসলমানদের অবস্থান ও সংখ্যা এমন নয় যে, তারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করতে পরে– এ মনোভাব সাম্প্রতিককালে আরববিশ্বের সবচেয়ে বড় রোগ। তারা ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হতে যাচ্ছে। ইসলাম ধর্মীয় দিক দিয়ে, সংস্কৃতি-সভ্যতা, পার্থিব-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বিশ্ববাসীর জন্যে মুক্তি ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে– এ কথা তাদের বুঝে আসে না। তাদেরকে ইসলামের প্রতি আত্মবিশ্বাসের দাওয়াত দেয়া বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

প্রথমে নিজের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করুন

আপনারা নিজেদের মধ্যে আরবদেরকে প্রভাবিত করার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করুন। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ভাষা ও লেখায় প্রভাব, আকর্ষণ ও সাহিত্য থাকা। যেন আরবরা পড়ে বলে, বাহ! কত সুন্দর লেখা। আলহামদু লিল্লাহ! 'নদওয়াতুল উলামা'র মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম (গবেষণা ও ইসলাম প্রচার পরিষদ) এর প্রকাশিত আরবী সাহিত্যগ্রন্থ (Arabic Literatures) আরববিশ্বে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। তারা আনন্দ-উৎসাহ নিয়ে পাঠ করে এবং অপরকে পাঠ করে শোনায়। আমি একবার মক্কা মুকার্‌রমায় মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীর বাসায় ছিলাম। সেখানে প্রফেসর আবদুল হাকীম আবেদীন (তিনি উচ্চশিক্ষিত ও খতিব এবং হাসানুল বান্না শহীদের বোনাই) একটি পুস্তিকা পড়তে লাগলেন। আমি কোনো এক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম। এসে দেখি তিনি পুস্তিকাটি পড়ছেন আর কাঁদছেন। আমাকে দেখে আমার নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বইটি কার লেখা? আমি বললাম, আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ আল-হাসানীর লেখা। তিনি বললেন, তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিবেন। এটি 'الإسلام بين لا و نعم।' গ্রন্থ ছিল।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা

আপনারা নিজেদের মধ্যে আরবদের মাঝে দাওয়াতি কাজের যোগ্যতা সৃষ্টি করুন। এটা দুনিয়া ও আখেরাতের মহান একটি কাজ। আল্লাহ

তা‘আলাই উপকরণের ব্যবস্থা করে দিবেন। প্রথমত টার্গেট নির্ধারণ করুন যে, নিজেদের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। এর দ্বারা আরবদেরকে দ্বীনের উপর অবিচল থাকার দাওয়াত দেয়া সম্ভব হবে। আমার লেখা কিতাবের মধ্যে ‘إلى الإسلام من جديد’، ‘أجاهلية بعد الإسلام أيها العرب؟’، ‘إلى الرأية المحمدية أيها العرب’ আরবদেরকে জাগ্রতকারী গ্রন্থাবলী। তারা যেন আপনার লেখা পড়ে বলে, একজন অনারব, ইন্দো-পাক সংস্কৃতির অধিকারী আমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে! তার মধ্যে ইসলামের প্রতি যে দৃঢ়বিশ্বাস ও আস্থা আছে আমাদের মধ্যে তা নেই! আল্লাহ চাহে তো আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের এর চেয়ে উত্তম আর কোনো পন্থা হতে পারে না যে, আপনার মাধ্যমে এ উম্মতের ওইসব লোকদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি আস্থা ফিরে আসবে, যাদের মাধ্যমে ইসলাম নামক নেয়ামত সারা বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। অন্যদের তুলনায় নদওয়াতুল উলামার ফাযিলদের মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা বেশি থাকা উচিত যে, যাদের মাধ্যমে আমরা ইলম পেয়েছি। যাদের ভাষায় দ্বীনের জ্ঞান পেয়েছি। তাদের আমানত তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের মধ্যে দ্বীনী সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করতে হবে। মূলত তারা শিক্ষক, আমরা শিষ্য। তারা পীর, আমরা মুরীদ। তারা পথপ্রদর্শক আর আমরা তাদের মাধ্যমে পথপ্রাপ্ত। এ উদ্দেশ্যেই ‘معهد الدعوة’ (দাওয়াহ অনুষদ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা একটি উত্তম ও প্রশংসার উপযুক্ত পদক্ষেপ। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সহকর্মীদের ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করেন।

একমাত্র ইসলামই সফলতার সোপান

বর্তমান যুগ অনুপাতে দেশ-পরিবেশ, শিক্ষিত ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে সামনে রেখে এ কথা অন্তরে গেঁথে নিন যে, যুগ যতই বদলে যাক না কেন, দ্বীন কিন্তু বদলেনি। দ্বীন এখনও পরিপূর্ণ এবং অপরিবর্তিত। বর্তমান যুগেও একমাত্র ইসলামই সরল পথের সঠিক দিশারী। আমরা একমাত্র দ্বীনের মাধ্যমেই সফলকাম, বিজয়ী এবং আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য-সহযোগিতা প্রাপ্তির যোগ্য হতে পারবো।

এ কাজটি স্থানীয়ভাবে এবং শহরে তথা সব জায়গায় করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজের মাঝে, যারা প্রথমে ইংরেজী সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল আর এখন হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তাদের হিন্দুয়ানি কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনী (ہندو دیو مالا) ও হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

আরবী সাহিত্যচর্চার তুচ্ছ উদ্দেশ্য

আপনাদের আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য যেন এমন না হয় যে, আরবদেশে গিয়ে চাকরি করবো। তা না হলে মুআযযিনী বা ইমামতি করবো। এটা আপনাদের শান ও মর্যাদা নয়। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ., মাওলানা সাইয়েদ জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী রহ., মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই রহ. এবং দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার পরিকল্পনাকারী-উন্নয়নকারী আল্লামা শিবলী নোমানী রহ., মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রহ. ও তাদের খোদাভীরু সাথীদের উদ্দেশ্য এমন ছিল না। বরং তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল, আপনারা ইসলামের দায়ী হবেন। মুসলমানদের মধ্য থেকে ইসলাম বিরোধী দর্শন ও মতবাদের ভীতি দূর করবেন, যা পশ্চিমা লেখকদের বই-পুস্তক থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যাতে আরবরা বলতে পারে, "بضاعتنا رُدت إلينا" (আমাদের আমানত আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হলো)। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এর তাওফীক দান করেন। আমীন!

وصلى الله تبارك وتعالىٰ على خير خلقه
سيدنا ومولانا محمّد وأله وأصحابه وسلم

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয়

অনুবাদ ও গ্রন্থনা

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

আরেফবিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ও
শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর সংশ্রবপ্রাপ্ত

দুটি কথা

১৯৯০, ৩০শে অক্টোবরের রক্তঝড়া, ধ্বংসাত্মক ভোরের বিপর্যয় কেটে গেল। তারপর আরও কতই না দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলো। বাবরী মসজিদ শহীদ করা হয়। বহু স্থানে মুসলমানদের সাথে আগুন ও রক্তের হলি খেলা হয়। এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। বরং ভারত বিভক্তির (১৯৪৭ ঈ. সালের) পর থেকেই দেশজুড়ে এরূপ খেলা চলে আসছে। কিন্তু গুজরাটের চলমান হাঙ্গামা মুসলমানদেরকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। ইতিপূর্বে এ ধরণের পরিকল্পিত কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেনি। এতে সরকার শুধু দর্শকের ভূমিকাই পালন করেনি বরং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদেরকে সহায়তাও দিয়েছে। এ দ্বারা দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত নড়ে গেছে। মনে হচ্ছিল এদেশে শুধু কট্টরপন্থা, সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুত্বের আইন প্রচলিত, যা পুরো দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আক্রমণাত্মক মনোভাবের কট্টরপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলো উঠে পড়ে লেগেছে।

এই পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য বড়ই দুষ্কর এবং ভাবনীয় যে, তাদের ভবিষ্যত কী হবে? তারা এদেশে কীভাবে বাস করবে? নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা, আত্মবিশ্বাস, শক্তি ও ঐক্য কীভাবে প্রদর্শন করবে? বক্ষমান প্রবন্ধটিতে সেসব জটিল প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এ প্রবন্ধটি তখন লিখেছিলেন যখন মুসলমানরা ১৯৯০, ৩০শে অক্টোবরের দাঙ্গা-হাঙ্গামা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাদের মনে বিভিন্ন প্রকারের সন্দেহমূলক প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল। হযরত ওয়ালা রহ. তাঁর অসাধারণ লিখনী শক্তি দ্বারা পুরো ইসলামী ইতিহাস সামনে রেখে একটি উত্তম সমাধান পেশ করেছেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্যই 'সাইয়েদ আহমাদ শহীদ একাডেমী'র দায়িত্বশীলগণ প্রয়োজন মনে করেন, হযরতের এই ছয় দফাবিশিষ্ট প্রাজ্ঞাপূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশ করা উচিত। এতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয় এবং চিন্তাশীলদের জন্যে বিশেষ বার্তা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এটি কবুল করেন। আমীন!

বিলাল আবদুল হাই হাসানী
২৬ মুহাররম ১৪২৩ হি.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على من لا نبى بعده

বর্তমান প্রেক্ষাপট

বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্ব বিশেষ করে হিন্দুস্তান এমন একটি সংকটময় সময় পার করছে, যার উদাহরণ পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসে মেলে না। অথচ এখানে যুগ যুগ ধরে ইসলামী সংস্কৃতি-সভ্যতা এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজত্ব ছিল। এখানে সংস্কারমূলক জবরদস্ত আন্দোলন চলেছিল। ধর্মসংস্কারক ও আল্লাহওয়ালা উলামা জন্মেছিলেন। তাদের দাওয়াতি কাজ গোটা ইসলামীবিশ্বে বিস্তার লাভ করে প্রশংসিত হয়েছে।

এ সংকটময় সময়ে মুসলমানদের জন্যে ধর্মীয় পরিচয়, দ্বীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ, দেশ ও সমাজের সঠিক পথপ্রদর্শন, বিশ্বস্রষ্টার সঠিক পরিচয় তুলে ধরা এবং তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা আশঙ্কাযুক্ত হয়ে পড়েছে। সঠিক দ্বীনের দাওয়াত প্রদান তো বহু দূরের কথা এমনকি তাদের জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষা করা, সম্পদ-সম্মান, মসজিদ-মাদরাসা এবং যুগযুগান্তের দ্বীন ও জ্ঞানের মহাসম্পদ রক্ষা করাই বড় দায় হয়ে পড়েছে।

মুসলমানরা শুধু দূর-দূরান্তের গাওঁ-গ্রামেই নয় বরং যেসব এলাকায় তাদের বিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গ বাস করেন এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে এমন বড় বড় কেন্দ্রীয় শহরগুলোতেও ভয়-ভীতির জীবন যাপন করছে। এমনকি কোথাও কোথাও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যা কুরআন মাজীদ তার অলৌকিক বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ﴾

"যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠল।"[১]

পূর্ববর্তী ইতিহাসে এমন অবস্থার মাত্র একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। তা হলো, সপ্তম হিজরী (ত্রয়োদশ ঈসায়ী) শতাব্দীতে তাতারিরা তুরস্ক,

১. সূরা তাওবা, ৯: ১১৮

ইরান ও ইরাকের উপর আক্রমণ করে শহর কে শহর ধূলিসাত ও বিলীন করে দেয়। এ আক্রমণ দ্বারা ইসলামীবিশ্বের নকশা বদলে যায়। কিন্তু এটা একটি হিংস্র ও অসভ্য জাতির সামরিক আক্রমণ ছিল মাত্র। তাদের নিকট দাওয়াত, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্মীয় গোঁড়ামি ইত্যাদির কিছুই ছিল না। ছিল না সামাজিক গণহত্যার (Cultural Genocide) কোনো পরিকল্পনা। তারা সুসম কোনো সংস্কৃতি বা দর্শনের বাহক ছিল না। ভাগ্যক্রমে তখন দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ, মহান অধ্যত্মিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রভাব বিস্তারকারী দায়ী (আহ্বানকারী) বিদ্যমান ছিলেন। তাদের সংশ্রবের বরকতে পুরো তাতারি জাতি শুধু মুসলমান হয়নি বরং দ্বীনে ইসলামের ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। তারা বিশাল, জবরদস্ত ও শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ প্রফেসর টি. ডাবলিউ আরনাল্ড তার রচিত 'ইসলামের দাওয়াত' (Preaching of Islam) গ্রন্থে লিখেন:

> "ইসলাম তার হারানো ক্ষমতা ও শান-শওকতের স্তুপ থেকে আবারও জেগে উঠল এবং মুসলমান ধর্মসংস্কারকগণ ওইসব শাসকদেরকে মুসলমান করে ফেলল, যারা মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতনের কোনো প্রকার বাকি রাখেনি।"[১]

আজকের প্রেক্ষাপটে ইসলামী দেশগুলোর তুলনায় ওইসব দেশের পরিস্থিতি আরও বেশি স্পর্শকাতর যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু এবং অতীতে তারা সেদেশ শাসন করেছিল। এসব দেশে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুসলমানদের ইতিহাস বিকৃত করে রচনা ও উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের মানসিকতা তৈরি হয়।

আবার কখনও কখনও ওইসব দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিংবা সমসাময়িক বিষয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানকারী সংগঠনগুলো অসম (Unbalanced) আবেগ-অনুভূতি, অদূরদর্শিতা এবং নাম-সুনাম অর্জনে অধিক আগ্রহী হওয়ার কারণে অপরিপক্ব ও মারমুখি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে সেখানকার মুসলমানদেরকে ধর্মীয় হিংসা-বিদ্বেষ এবং সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের সম্মুখীন (Confrontation) হতে

---

১. T. W. Arnold, The Preaching of Islam (London, 1935, pg. 227)

হয়েছে। তাছাড়া সেখানে পাঠ্যক্রম (Syllabus), সংবাদ মাধ্যম (Press) ও গণমাধ্যমের (Public Media) দ্বারা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক থেকে পথভ্রষ্ট করার পাঁয়তারা চলছে।

এমতাবস্থায় শুধু ঈমানদারগণ, ধর্মীয় চেতনায় বিশ্বাসী এবং দ্বীনের গভীর জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তিবর্গই নন বরং যারা দ্বীনের সামান্যতম জ্ঞান রাখে, আশপাশের ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখে, পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং খবরা-খবর শোনে এমন সাধারণ মুসলমানরাও মারাত্মকভাবে উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত। তারা কখনও নিরাশ হয়ে যায়। আবার কখনও সময়ের কাছে হার মেনে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়। কিন্তু সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা, যিনি দ্বীনের হেফাযতকারী, হকের পক্ষপাতী, অসহায়দের সহায়, রিক্তহস্তদের উন্নয়নকারী এবং অহংকারীদের পতনকারী, তাঁর পক্ষে মহাবিপ্লব ঘটানো বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো কঠিনসাধ্য নয়। মুসলমান সেই এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং সাক্ষ্য দেয়:

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

"বলুন, ইয়া আল্লাহ! তুমি সর্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।"[১]

যখন একটি প্রবল ও বিজয়ী রাষ্ট্রের ধৃত ও পরাজিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কেউ এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম ছিল না। তখন এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়:

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ○ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ○ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ○

১. সূরা আলে ইমরান, ২: ২৬

"রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"[১]

তবে এই পরিবর্তনশীল অবস্থা ও আশঙ্কা থেকে উত্তরণের উপায়-উপকরণ হচ্ছে, আল্লাহর বিধান, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শিক্ষা, তাঁর চরিত ও সুন্নাত এবং তাঁর হাতে গড়া শ্রেষ্ঠ দল সাহাবায়ে কেরামের আমল। বক্ষমান প্রবন্ধটিতে কুরআন-হাদীস, রসূল চরিত এবং সাহাবা চরিতের আলোকে সমাধানস্বরূপ কয়েকটি উপদেশ ও দিকনির্শেনা পেশ করা হয়েছে।

প্রথম উপদেশ

আল্লাহর অভিমূখী হতে হবে

বর্তমান প্রেক্ষাপটে গোটা বিশ্বের মুসলমানদের, বিশেষ করে ভারতবাসী মুসলমানদের সর্বপ্রথম কর্তব্য এবং অতীব জরুরি কাজ হচ্ছে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। তওবা-ইস্তিগফার করা। মনোযোগ সহকারে দু'আ ও আহাজারি করা। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে:

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ○

---

১. সূরা রূম, ৩০: ২-৫। সপ্তম ঈসায়ী শতাব্দীর শুরুর দিকে সাসানী সাম্রাজ্য (প্রাচীন ইরানের সাসান ইবনে কাহমানের রাজবংশ) রোম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করে রোম ও মিসরের বাজেন্টাইন সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। পূর্ব ইউরোপে পরিপূর্ণ বিজয় লাভের পর আবার রোমকদের নিকট পারসিকদের পরাজয় আর রোমকদের বিজয়ের কথা এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পরাজয়ের শেষ মুহূর্তে কুরআন মাজীদ এমন ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে নয় বছরের মধ্যে বিজয় লাভ করবে। ঠিক তেমনই ঘটল। সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা বিজয়ী হয়। ইউরোপের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) লিখেন:

"মুহাম্মাদ (স.) ইরানী সাম্রাজ্যের যৌবনকালে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই রোমকরা বিজয়ী হবে এবং রোম সাম্রাজ্যের বিজয়ের পতাকা উড়বে। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তখন এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল চরম অবোধগম্য ও ধারণাতীত। কেননা হিরাকলের প্রাথমিক বারো বছরে রোম সাম্রাজ্য শুধু পরাজিত হয়ে আসছিল।"

রোমকদের পরাজয়ের ইতিহাস
(Decline and Fall of the Roman Empire)
খ. ৩, পৃ. ৩০৩, ১৮৯০ ঈ. প্রকাশিত

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[১]

﴿اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ﴾

"বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন।"[২]

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করো আন্তরিক তওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দিবেন।"[৩]

স্বয়ং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোবারক অভ্যাস ছিল, সামান্য কোনো পেরেশানীর সম্মুখীন হলেই নামায শুরু করে দিতেন এবং দীর্ঘ সময় দু'আয় মগ্ন থাকতেন।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزِبَهُ أَمْرٌ صَلّٰى.

হযরত হুযাইফা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সামান্য পেরেশান হলেই নামায শুরু করে দিতেন।[৪]

হযরত আবু দারদা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যাস ছিল, ঘূর্ণিঝড়ের রাতে তিনি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং ঘূর্ণিঝড় না থামা পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করতেন। তেমনিভাবে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে নামাযের দিকে ধাবিত হতেন এবং গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকতেন।[৫]

---

১. সূরা বাকারা, ২: ১০৩
২. সূরা নমল, ২৭: ৬২
৩. সূরা তাহরীম, ৬৬: ৮
৪. সুনানে আবু দাউদ, ২/৩৫, হা. নং ১৩১৯
৫. মু'জামুল কাবীর লিত-তবরানী

সুতরাং এমন অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ-মুনাজাত এবং তিলাওয়াত করা উচিত। বিশেষ করে ওইসব আয়াত তিলাওয়াত করা উচিত, যাতে শান্তি-নিরাপত্তা, সাহায্য ও বিজয়ের কথা আলোচিত হয়েছে। যেমন– সূরা ফীল, সূরা কুরাইশ এবং দু'আয়ে ইউনুস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উপদেশ

খাঁটি তওবা করতে হবে

দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে, গুনাহ থেকে তওবা করতে হবে। গুনাহ ত্যাগ করতে হবে এবং অপরের হক আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. (৬৩–১০১ হি./ ৬৮২–৭২০ঈ.) এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করা যথেষ্ট মনে করছি, যা তিনি তার সেনাপ্রধানকে লিখে পাঠিয়েছিলেন।

আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশনামা মানসূর ইবনে গালিবের নামে। আমীরুল মুমিনীন তাকে যুদ্ধকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে এবং সন্ধিকৃতদের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমীরুল মুমিনীন তাকে নির্দেশ করলেন, "সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা খোদাভীতিই সর্বোত্তম পন্থা, সবচেয়ে বেশি কার্যকর প্রতিকার এবং আসল শক্তি। তাই আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ হলো, নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজ সঙ্গীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাফরমানী এবং গুনাহকে শত্রুর চেয়েও বেশি ভয় করবে। কেননা গুনাহ মানুষের জন্যে শত্রুর ষড়যন্ত্রের চেয়েও বেশি মারাত্মক। আমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করি এবং তাদের পাপের কারণেই তাদের উপর বিজয় লাভ করে থাকি। যদি আল্লাহর নাফরমানীতে তারা এবং আমরা এক রকম হয়ে যাই তাহলে শক্তি ও সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে তারাই আমাদের উপর বিজয়ী হবে; আর আমরা পরাজিত হবো। সুতরাং গুনাহের ক্ষেত্রে শত্রুর চেয়ে বেশি সতর্ক হোন এবং যথাসম্ভব কোনো জিনিসকে গুনাহর চেয়ে বেশি ভয় করবেন না।"[১]

---

১. উমর ইবনে আবদুল আযীয চরিত, তারীখে দাওয়াত ও আযীমত থেকে গৃহীত, ১/৪৫-৪৬

তৃতীয় উপদেশ

অমুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত করতে হবে

তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে, অমুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত করার চেষ্টা করুন। এর সামান্যতম সুযোগও হাতছাড়া করবেন না। মুসলমানদের কাছে আছে সবচেয়ে শক্তিশালী, প্রাকৃতিক, সহজ-বোধগম্য, আকর্ষণীয় এবং মন-মস্তিষ্ক জয়কারী দ্বীন। আরও আছে অলৌকিক কিতাব কুরআন মাজীদ এবং মন-মস্তিষ্ককে আকৃষ্টকারী শেষ নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসাধারণ চরিত বা সীরাত। বোধগম্য এবং আমলের উপযোগী ইসলামের এমন শিক্ষা, যদি তা পরিষ্কার ও খোলা মনে পাঠ করা হয় তাহলে মন-মস্তিষ্ককে অবশ্যই প্রভাবিত করবে। ইসলাম এই পৃথিবীর বিশাল আয়তন ও বহু জ্ঞানপাপী জাতিকে তার অনুরাগী ও প্রেমিক বানাতে সক্ষম হয়েছিল। যুগযুগ ধরে নিজেদের পৃথক সংস্কৃতি, দর্শন ও রাষ্ট্র শাসনের ঐতিহ্য রাখে এমন বহু দেশ ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের পতাকাবাহী এবং দায়ী (আহ্বানকারী) হয়েছে।

এটা একটি তিক্ত বাস্তবতা যে, মুসলমানরা এদেশে (হিন্দুস্তানে এবং অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে) নিজেদের দায়িত্ব পালনে এমনকি দায়িত্ববোধেও অবহেলা করেছে। এর ফলে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি ইসলামের দৈনন্দিন ইবাদত ও আমল (আযান-নামায ইত্যাদি, যা ছোট-বড় প্রত্যেক শহরে, পাড়া-মহল্লা ও গাওঁ-গ্রামে দৈনিক পাঁচবার অনুষ্ঠিত হয়) সম্পর্কে মাঝেমধ্যে এমন উদ্ভট প্রশ্ন করে যে, তাতে হাঁসি না পেয়ে বরং কান্না পায়। তারা কল্পনাতীতভাবে এগুলোর উদ্দেশ্য ও ভাষ্য সম্পর্কে অনবগত। যারা অধিক হারে ভ্রমণ করেন এবং অমুসলিমদের সাথে উঠা-বসা রাখেন প্রায়শই তারা এরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকেন।[১] অমুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত করার উদ্দেশ্যে ইসলামের পরিচিতি সম্পর্কিত উর্দূ, ইংরেজী ও হিন্দীতে রচিত কিতাবাদি দ্বারা সহায়তা গ্রহণ করুন।[২]

---

১. লেখক তার 'এক দৃষ্টিতে হিন্দুস্তানী মুসলমান' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং বিস্ময় ও আফসোস প্রকাশ করেছেন।

২. যেমন– মাওলানা মনজুর আহমাদ নোমারী রহ. রচিত 'ইসলাম কী?'। লিপিকারের রচিত 'এক দৃষ্টিতে হিন্দুস্তানী মুসলমান' ও 'মুহসিনে আলম স.'। আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী

চতুর্থ উপদেশ

অমুসলিমদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে হবে

মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে এদেশে বসবাস করে আসছে এবং এদেশেই থাকতে হবে। নিজে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও বাঁচতে দেয়া; মানবিক ও নাগরিকত্বের ভিত্তিতে ঐক্য ও সহযোগিতা; জান-মাল-সম্মানের নিরাপত্তা প্রদান এবং মানুষকে ভালোবাসার তাবলীগ করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসা এবং আপসের মিল-মহব্বতই এদেশের সমাজ ও পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে পারে। যেহেতু এ দেশটি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির দেশ সেহেতু এ দেশের উন্নয়ন, সুনাম, শান্তি ও নিরাপত্তা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আপসের মিল-মহব্বত ব্যতীত সম্ভব নয়।

এ আন্দোলন 'মানবতার পয়গাম' শিরোনামে কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছিল। হিন্দুস্তানের প্রায় সকল বড় শহরে এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অমুসলিম বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত শ্রেণী এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একটি বড় সংখ্যা অংশগ্রহণ করেছে। এ আন্দোলনের পরিচিতি, প্রয়োজন ও পয়গাম সম্পর্কে উর্দূ, হিন্দী এবং ইংরেজীতে পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহীগণ সহজেই তা সংগ্রহ করতে পারেন।[১]

পঞ্চম উপদেশ

মুসলমানদেরকে আত্মত্যাগী হতে হবে

মুসলমানদের মধ্যে (বিশেষ করে যেসব দেশে তারা সংখ্যালঘু এবং জুলুম-নির্যাতনের শিকার) আপোষকামী মনোভাব, ধৈর্য-সহনশীলতা-

---

রহ. রচিত 'রহমতে আলম স.' ও 'রসূলে ওয়াহদাত' এবং কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান মনসূরপুরী রচিত 'রহমাতুল্লিল আলামীন স.'। এসব কিতাবের ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ড. হামীদুল্লাহ হায়দারাবাদী কর্তৃক ইংরেজীতে রচিত 'Introduction to Islam'। এছাড়া অন্যান্য উপকারী কিতাব ও পুস্তিকা রয়েছে। [নদভী রহ.]

এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উপকারী কিতাব 'ইসলামের পরিচিতি' হযরত রহ. নিজেই রচনা করেছেন, যা উর্দূ, হিন্দী ও ইংরেজীতে অনুবাদ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এর দ্বারা অনেক উপকার হচ্ছে। হিন্দীতে 'ইসলাম এক পরিচে' নামে এবং ইংরেজীতে 'Islam An Introduction' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'কাসাসুন নাবিয়্যীন' এর হিন্দী অনুবাদও উপকৃত প্রমাণিত হয়েছে। এসব কিতাব যথাসম্ভব বেশি থেকে বেশি অমুসলিমদেরকে দেয়া উচিত। যাতে তারা ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হয়। [বিলাল হাসানী]

১. 'মানবতার পয়গাম', পোস্ট বক্স-৯৩, নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ, ইন্ডিয়া– এ ঠিকানায় যোগাযোগ করে সংগ্রহ করতে পারেন।

দৃঢ়তা, উদারতা ও কোরবানী, সাহস ও দৃঢ়সংকল্প থাকা চাই। দ্বীনের পথে আগত বিপদাপদ হাসিমুখে সহ্য করার এবং এর প্রতিদানে আল্লাহর সাক্ষাত, পুরস্কার ও জান্নাত লাভের আগ্রহ থাকা উচিত। আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ফযীলত সর্বক্ষণ স্মরণে থাকা উচিত। সেজন্য সাহাবায়ে কেরাম র. এর জীবনী এবং ইসলামের দায়ী বীর পুরুষগণের কৃতিকার্য অধ্যয়ন করা এবং অন্যদেরকে পড়ে শোনানো দরকার। তাঁরা আল্লাহর পথে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। জান-মালের কোরবানী পেশ করেছেন। এ কাজকে সর্বোত্তম আমল, আল্লাহর নৈকট্যতা ও জান্নাত লাভের মাধ্যম মনে করেছেন।

নিকটবর্তী অতীতকালেও শিক্ষিত ও দ্বীনদার পরিবারে আল্লামা ওয়াকেদী রহ. রচিত 'ফুতূহুশ শাম' গ্রন্থের উর্দূ কাব্যানুবাদ 'সমসামুল ইসলাম'[১] (ইসলামের তলোয়ার) বাসায় বাসায় এবং বিভিন্ন মজলিসে পাঠ করে শোনানো হতো। শ্রোতাদের মন-মস্তিষ্কে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। বর্তমান পরিবেশে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহারনপুরী রহ. রচিত 'হিকায়াতে সাহাবা', হাফীয জালেন্ধরী রচিত 'শাহনামায়ে ইসলাম' এবং অধমের রচিত 'যখন ঈমানের বসন্ত এলো' বাসায়, মসজিদে এবং বিভিন্ন মজলিসে পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

ষষ্ঠ উপদেশ

নতুন প্রজন্মকে দ্বীনী শিক্ষা দিতে হবে

সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হচ্ছে, প্রত্যেক পরিবারের পিতা-মাতা এবং দায়িত্বশীলগণের একান্ত উচিত তাদের সন্তান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে দ্বীনের জরুরি বিষয়াদি, ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস, ইসলামী দায়িত্ববোধ, ইসলামী শিষ্টাচার এবং দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা। পিতা-মাতা যেভাবে সন্তানদেরকে খোর-পোষ ও চিকিৎসা প্রদান

---

১. এটা মুনশী সাইয়েদ আবদুর রাজ্জাক অনূদিত কাব্যানুবাদ। তিনি ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর মহান মুজাহিদ ও ধর্মসংস্কারক ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহ. এর বংশধর। কিতাবটি মুনশী নোল কিশোর লাখনৌ ছাপাখানা থেকে দু'বার প্রকাশ পেয়েছিল। গ্রন্থটি আবারও প্রকাশ ও প্রচার করা উচিত এবং বাসায় বাসায় ও বিভিন্ন মজলিসে পড়ে শোনানো উচিত।

করা নিজেদের দায়িত্ব মনে করেন তেমনিভাবে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করাকে মানবিক ও ইসলামী দায়িত্ব মনে করতে হবে। এ দায়িত্ব তাদের নিজেদেরকেই পালন করতে হবে। বরং সঠিক দ্বীনী শিক্ষা প্রদান এবং সহীহ ইসলামী আকীদা শিক্ষাদানের বিষয়টি ওইসব শারীরিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। আর এ বিষয়ে অবহেলা করা পার্থিব প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বে অবহেলা করার চেয়ে বেশি মারাত্মক এবং পরবর্তী অশুভ পরিণামের কারণ। কেননা দ্বীনী শিক্ষা এবং সঠিক ইসলামী আকীদা শিক্ষার বিষয়টি অনন্ত ও চিরন্তন জীবনের (মৃত্যু পরবর্তী জীবনের) ভালো-মন্দ পরিণামের সাথে সম্পৃক্ত। তাই দায়িত্বশীলদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে অগ্নি থেকে রক্ষা করো।"[১]

এ বিষয়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[২]

তোমাদের প্রত্যেকেই একজন প্রশাসক এবং অধীনস্থদের দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকের কাছে তার জনতা ও অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং বাড়িতে বাড়িতে, পাড়া-মহল্লায়, প্রত্যেক মসজিদে এবং মক্তব-মাদরাসায় বাচ্চাদের ও বড়দের দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা থাকা চাই। প্রত্যেক বিবেকবান মুসলমান ও পিতা-মাতাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

❑ ❑ ❑

১. সূরা তাহরীম, ৬৬: ৬

২. সহীহ বুখারী, খ. ৯, পৃ. ৬২, হাদীস নং ৭১৩৮

৪

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

আরববিশ্ব পশ্চিমাবিশ্বের টার্গেট কেন?

অনুবাদ ও গ্রন্থনা

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

আরেফবিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ও
শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর সংশ্রবপ্রাপ্ত

—— ঃ প্রকাশনায় ঃ ——

বাইতুল কিতাব

১৮/১৩, ব্লক–এইচ, মিরপুর–১, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৫১১ ৯৪২৯৬৫, ০১৭১৪ ৩২৩২৯৬

প্রথম প্রকাশ (একত্রে): ফেব্রুয়ারি ২০১৩

পরিবেশনায়

দারুল হাদীস	মাকতাবাতুয যাকারিয়া
দোকান নং- ২৪, ইসলামী টাওয়ার	বাসা- ৩২, ব্লক- ডি
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭৩০ ৯৯৫৭৭২	মোবাইল : ০১৭১২ ৯৫৯৫৪১

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

আরববিশ্বের গুরুত্ব

বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে আরববিশ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড। ইতিহাসে যেসব জাতি মানবকল্যাণে অবদান রেখেছে তার মধ্যে আরবজাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তার কাছে রয়েছে শক্তি ও সম্পদের মহাভাণ্ডার। রয়েছে পেট্রোল, যা বর্তমান যুগে যুদ্ধ ও শিল্পক্ষেত্রে ততটাই আবশ্যকীয় যতটা শরীরের জন্যে রক্ত। মূলত আরব ভূখণ্ড হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকা ও সুদূর প্রাচ্যদেশের মাঝে সংযোগস্থল।

আরববিশ্ব হচ্ছে ইসলামীবিশ্বের হৃদয়ের স্পন্দন। আধ্যত্মিক ও দ্বীনের ক্ষেত্রে গোটা ইসলামীবিশ্ব তার অভিমুখী। সর্বক্ষণ তার প্রসংশায় রত এবং তার ভালোবাসায় মাতোয়ারা। আরববিশ্বের গুরুত্ব এজন্যও বেশি যে, আল্লাহ না করুন তার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণক্ষেত্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে রয়েছে মজবুত বাহু। সাহসী হৃদয়। যুদ্ধ করার মতো শক্তিশালী শরীর। চিন্তা-চেতনার মানসিকতা। আরও আছে বড় বড় বাণিজ্যককেন্দ্র, বাজার এবং উৎপাদনশীল ভূমি।

আরব ভূখণ্ডেই রয়েছে মিসর। উৎপাদন, উর্বরতা, সবুজ-শ্যামল, সম্পদ ও উন্নয়ন এবং সংস্কৃতি-সভ্যতায় তার বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। তার বক্ষে প্রবাহিত হয় নীল নদ।

এ ভূখণ্ডে রয়েছে ফিলিস্তীন ও তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশ। আব-হাওয়ার কোমলতা, ভৌগলিক সৌন্দর্য ও যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে তার বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে।

এ ভূখণ্ডে ইরাক অবস্থিত। সে তার বীরত্ব ও সাহসিকতা, দৃঢ়সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রম এবং পেট্রোলের জন্যে প্রসিদ্ধ।

এখানে রয়েছে মক্কা-মদীনা ও হিজায তথা আরব উপদ্বীপ। যা আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও দ্বীনী প্রভাবের ক্ষেত্রে সবার উর্ধ্বে। তার বাৎসরিক হজ্বের ইজতেমার মতো দ্বিতীয়টি বিশ্বের কোথাও নেই। পেট্রোল ও তেলের কূপ এখানেই সবচেয়ে বেশি।

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরববিশ্ব পশ্চিমাবিশ্বের টার্গেটে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে পশ্চিমাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের লড়াই চলছে। এর ফলে সেখানে আরব জাতীয়তাবাদ ও দেশপূজার প্রবল মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে।

রসূলুল্লাহ স. আরববিশ্বের পরিচয়

আরববিশ্ব সম্পর্কে একজন মুসলমান এবং একজন ইউরোপিয়ান ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে আসমান-জমিনের পার্থক্য রয়েছে। বরং একজন জাতীয়তাবাদী আরবের চেয়ে সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা। সাধারণ মুসলমান আরববিশ্বকে ইসলামের কেন্দ্র, মানবতার আশ্রয়স্থল, বিশ্বনেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু এবং আলোর মিনার মনে করে। তার বিশ্বাস হলো, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামই আরববিশ্বের প্রাণ, অস্তিত্বের ভিত এবং মান-সম্মানের উপায়। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আরববিশ্ব থেকে আলাদা করা হলে শক্তির ভাণ্ডার ও অঢেল সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আরববিশ্বের অবস্থা হবে প্রাণহীন একটি লাশের মতো। তাঁর মহান ও বরকতময় ব্যক্তিত্বের কারণেই আরববিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করে। অন্যথায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামপূর্ব আরববিশ্ব ছিল দাস-দাসীর জাতি। বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। আপসের হানাহানিতে লিপ্ত। যোগ্যতার অপব্যবহারে মগ্ন। মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার পথের পথিক। আরবরা তখন রোম সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। শাম (বর্তমানের সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তীন) যদিও পরবর্তীতে আরববিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গণ্য হয়েছে কিন্তু তখন আরবভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ উপনিবেশ (Colony) ছিল মাত্র। স্বৈরশাসক সরকার ও কট্টর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) দ্বারা শোষিত ছিল এবং স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতার অর্থও বুঝত না।

ইরাক ছিল কায়ানী সরকারের অধীনস্থ। নতুন নতুন শুল্ক ও ট্যাক্স আরোপের কারণে তার কমর বেঁকে গিয়েছিল।

রোম মিসরের সাথে একটি গৃহপালিত গাভীর ন্যায় আচরণ করে আসছিল। অর্থাৎ দুধ দোয়ানো ও কাজের বেলায় পুরো ষোল আনা আদায় করে নিত। কিন্তু চারা দেয়ার ক্ষেত্রে ছিল চরম কৃপণ। সেখানে রাজনৈতিক স্বৈরাচারের পাশাপাশি ধর্মের কারণেও জুলুম-নির্যাতন বিদ্যমান ছিল।

যখন আরববিশ্ব ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে। তখন বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন ও নির্যাতিত এই আরববিশ্বে হঠাৎ ইসলামের বসন্ত বয়ে গেল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদেরকে উদ্ধার করলেন। তাদের জীবন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনিই তাদেরকে নতুন জীবনের আলো দেখালেন। কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন। আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে পূত-পবিত্র করলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের পর আরববিশ্বে মহাবিপ্লব ঘটে। ফলে তারা ইসলামের দূতে পরিণত হয়। শান্তি -শৃঙ্খলা এবং সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্ষেত্রে নমুনা (Ideal) হয়ে যায়। গোটা মানবজাতির জন্যে শান্তির প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলে সিরিয়া ও ইরাকের নাম সম্মানের সাথে উচ্চরিত হয়। মিসরকে নিয়ে গর্ব করা যায়। যদি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব না হতো এবং তিনি ইসলামের দাওয়াত না দিতেন তাহলে আজ সিরিয়া, ইরাক ও মিসরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। আরববিশ্ব আর আরববিশ্ব হতো না। শুধু তাই নয় বরং গোটা পৃথিবীর সংস্কৃতি-সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নয়নের চিত্র হতো ভিন্ন। —— এখন আরবজাতি ও তাদের শাসকগোষ্ঠী যদি ইসলাম ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমাবিশ্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের ধাঁচে জীবন যাপন করতে চায়। কিংবা আরব জাহেলী যুগে ফিরে যেতে চায়। অথবা যদি তাদের জীবনধারা, রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় পশ্চিমাদের রীতি-নীতি অনুসরণ করতে চায় এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে নিজেদের নেতা, ইমাম, পথপ্রদর্শক ও নমুনা (Ideal) মানতে না চায় তাহলে তাদের রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের থেকে প্রাপ্ত সকল দান-অনুদান পরিত্যাগ করে সেই জাহেলী যুগে ফিরে যাওয়া উচিত। যেখানে ছিল রোমক ও পারস্য স্বৈরশাসকের রাজত্ব। সর্বত্র ছিল জুলুম ও নির্যাতন। মূর্খতা ও বেকারত্ব। সেযুগের

আরবদের জীবনযাপন ছিল তৎকালীন উন্নত বিশ্বের (রোম ও পারস্যের) থেকে আলাদা ও নিম্নমানের। পরবর্তীতে তাদের এ শানদার ইতিহাস, আকর্ষণীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা, আরবী সাহিত্য এবং আরব সাম্রাজ্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবদান ও আগমনের বরকত মাত্র।

ঈমান আরববিশ্বের মূল শক্তি

ঈমান হচ্ছে আরববিশ্বের শক্তি আর ইসলাম তাদের জাতীয়তা। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদের নেতা ও ইমাম। ঈমানই তাদের শক্তির মূল উৎস। এই ঈমানের বলেই তারা অন্যান্য জাতির মোকাবিলা করে বিজয়ী হয়েছিল। অতীতের ন্যায় বর্তমান যুগেও তাদের মূল শক্তি ও হাথিয়ার হচ্ছে ঈমান। এই ঈমানী শক্তিবলে সে আবারও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে পারে। নিজেদের অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করতে পারে। অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছুতে পারে।

আরববিশ্ব যদি সমাজতন্ত্র, ইহুদীবাদ বা অন্য কোনো শত্রুর মোকাবিলা করতে চায় তাহলে সে ওইসব সম্পদ ও শক্তি (অস্ত্র) দিয়ে যুদ্ধ জয় করতে পারবে না, যা ব্রিটিশ তাকে দিয়েছে। যা আমেরিকা তাকে ভিক্ষায় দান করেছে। কিংবা যা সে পেট্রোল বিক্রি করে অর্জন করেছে। বরং সে শুধু ওই ঈমানী ও রুহানী শক্তি দ্বারা যুদ্ধ জয় করতে পারে, যার বলে বলীয়ান হয়ে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যকে একযোগে যুদ্ধের ময়দানে ডেকেছিল এবং যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল। *এমন অন্তর দিয়ে যুদ্ধ করা যাবে না, যে অন্তরে জীবনের মায়া এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা থাকে। ওই শরীর দিয়ে যুদ্ধ হবে না, যে শরীর আয়েশ ও আরামপ্রিয়। অপরিপক্ব জ্ঞান ও সন্দেহপূর্ণ ধ্যান-ধারণা দ্বারা যুদ্ধ করা যাবে না। তাদের স্মরণ থাকা উচিত যে, দুর্বল ঈমান এবং সন্দিহান অন্তর দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না।*

আরব নেতৃবৃন্দ ও আরবলীগের দায়িত্বশীলদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, আরব ফৌজ, কৃষক, ব্যবসায়ীসহ গোটা জাতির অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করা। তাদের অন্তরে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেরণা, জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা, যাতে নফসের চাহিদা ও প্রবৃত্তির লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আল্লাহর পথে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা এবং হাসিমুখে মৃত্যুকে স্বাগত জানানোর শিক্ষা দেয়া।

ঘোড়সাওয়ারি ও সৈনিক জীবনের গুরুত্ব

বড় মর্মান্তিক ও তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে, আরবজাতি তার বহু সামরিক বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করেছে। বিশেষ করে ঘোড়সাওয়ারি তাদের জীবন থেকে পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গেছে। এটি একটি মারাত্মক ক্ষতি এবং যুদ্ধের ময়দানে দুর্বলতা ও পরাজয়ের কারণ। এর ফলে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় পরিচয় সামরিক স্পৃহা শেষ হয়ে গেছে। তাদের শরীর দুর্বল ও অলস হয়ে পড়েছে। তাদের অভিজাত ও সুখময় জীবনে ঘোড়ার স্থান দখল করে নিয়েছে মোটর যান। এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আরবী ঘোড়া (Arabian Horse) আজ আরববিশ্ব থেকে বিলুপ্ত হতে বসেছে। তারা কুস্তি, ঘোড়সাওয়ারি, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং শারীরচর্চামূলক খেলাধুলা ভুলে ওইসব খেলায় মত্ত হয়েছে, যার কোনো উপকার নেই। সুতরাং আরববিশ্বের শিক্ষা-দীক্ষায় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে, আরব যুবকদের মধ্যে সামরিক জীবন, ঘোড়সাওয়ারি, সরলতা, সংযম, ধৈর্য, সংকল্প এবং বিপদাপদে দৃঢ় থাকার যোগ্যতা সৃষ্টিকারী প্রকল্প গ্রহণ করা। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক র. অনারব দেশগুলোতে নিযুক্ত গভর্নরদেরকে নির্দেশনা লিখে পাঠালেন:

أما بعد: فاتزروا وارتدوا وألقوا الخفاف والسراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي الأعاجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب وابرزوا وارموا الأغراض.

"লুঙ্গি-পায়জামা ও মোজা (সাধাসিধে পোশাক) পরিধান করুন। নিজ পিতা ইসমাঈল আ. এর পোশাক-পরিচ্ছদ বাঞ্ছনীয় করে নিন। অলস ও আরামপ্রিয় জীবন এবং অনারবদের পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে সর্বদা দূরে থাকুন। রোদে চলাফেরার অভ্যাস বহাল রাখুন। কেননা এটা আরবদের স্নান (উজ্জীবিত থাকার মাধ্যম)। পরিশ্রম ও সংযমী জীবন, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা এবং মোটা কাপড় পরিধানের অভ্যাস গড়ুন। লাফ দিয়ে অনায়াসে ঘোড়ার পিঠে চড়ার চর্চা থাকা চাই। নিশানাও (Target) সঠিক থাকা চাই।"[১]

---

১. তাফসীরে বাগবী

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

اِرْمُوْا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

"হে আরবগণ! তোমরা তীরন্দাযী চর্চা করো। কেননা তোমাদের পিতা হযরত ইসমাঈল আ. তীরন্দায ছিলেন।"[১]

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন:

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: ﴿وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ﴾ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

হযরত উকবা ইবনে আমির র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "স্মরণ রাখো! কুরআন মাজীদে যেই শক্তি প্রস্তুত রাখার তাকিদ করা হয়েছে [সূরা আনফাল, ৬: ৬০] তা হলো তীরন্দাযী।"[২]

শিক্ষা-দীক্ষায় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা প্রত্যেক ওই জিনিসের মোকাবিলা করবে যা পুরুষত্ব ও বীরত্বের স্পৃহা (Sprit) দুর্বল করে দেয়। মানসিক দুর্বলতা ও কাপুরুষতা (মেয়েলি স্বভাব) সৃষ্টি করে। নগ্ন-অশ্লীল এবং ধর্মহীন সাংবাদিকতা ও সাহিত্য প্রতিরোধ করবে। কেননা এ দ্বারা যুবকদের মধ্যে কপটতা, নির্লজ্জতা, পাপাচার, অপকর্ম ও যৌনতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। পেশাদার ক্রিমিনালরা যেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সামরিক শিবিরে (যুবকদের মাঝে) প্রবেশ করতে না পারে। এ নামধারী সাহিত্যিকরা ঘৃণিত কিছু টাকার জন্যে যুবকদের মধ্যে অপকর্ম,

---

১. সহীহ বুখারী, ৪/৩৮, হা. নং ২৮৯৯

২. সহীহ মুসলিম, ৩/১৫২২, হা. নং ১৯১৭। সেযুগে তীরই ছিল সর্বোত্তম যুদ্ধাস্ত্র। তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তীরন্দাযীকে শক্তি বলে অবহিত করেছেন। বর্তমান যুগে তীরন্দাযী ও ঘোড়সাওয়ারির পাশাপাশি গুলি-বন্দুক, তোপ-কামান, ট্যাংক (Tank), ক্ষেপণাস্ত্র (Missile), পরমাণু বোমা (Atom Bomb), হাইড্রোজেন বোমা (Hydrogen Bomb), যুদ্ধ-বিমান, চালকবিহীন বিমান (Drone), নৌ-বহর (Warship) এবং ডুবজাহাজ (Submarine) ইত্যাদি শক্তি হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে শক্তি প্রস্তুত করার অর্থ হচ্ছে, এ সকল প্রকারের শক্তি অর্জন করা। [অনুবাদক]

পাপাচার ও অশ্লীলতাকে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয়রূপে পেশ করে থাকে। তারা নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারা ও চরিত্র নষ্ট করতে চায়।

ইতিহাস সাক্ষী, যখন কোনো জাতির পুরুষ বীরত্ব ও সম্ভ্রমবোধ হারিয়ে ফেলে, আর নারীসমাজ নারিত্ব ও মাতৃত্ব প্রথার বিদ্রোহ করে স্বাধীনচেতা ও পর্দাহীনতার-নগ্নতার পথ বেছে নেয়। প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের প্রতিযোগী হতে চায়। সাংসারিক জীবনকে ঘৃণা ও অবহেলা করে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণে অতি আগ্রহী হয়। তখনই সে জাতির জীবনে অন্ধকার নেমে আসে এবং আস্তে আস্তে তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। গ্রীক, রোমক ও পারস্য জাতির পরিণতি হয়েছে এমনই। পশ্চিমাবিশ্ব আজ সে পথেই হাঁটছে, যার পরিণাম হবে তেমনই। সুতরাং আরববিশ্বের সতর্ক থাকা উচিত, যেন তাদের পরিণাম এমন না হয়।[১]

---

১. হযরত নদভী রহ. প্রায় তিন দশক পূর্বে আরবদেরকে সতর্ক হতে বলেছেন। তৎকালীন আরববিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হন। কিন্তু বর্তমান আরববিশ্বে আবস্থার আরও বেশি ও মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। ২৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের অনলাইন বাংলা পত্রিকা BanglaNews24.com এর একটি রিপোর্ট দ্বারা বর্তমান আরববিশ্বের সামাজিক অবনতির কিছু ধারণা পাওয়া যায়। রিপোর্টে বলা হয়, সৌদি আরবে দিন দিন বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রতি ঘণ্টায় তিনটি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। বার্ষিক হিসাবে তা ত্রিশ হাজারের বেশি, যা দৈনিক গড়ে ৮২টি। ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে দৈনিক এ সংখ্যা ছিল ৭৫। সৌদি আরবের স্থানীয় পত্রিকা 'আল-ইকতিসাদিয়া'র একটি জরিপের মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বাহরাইনে সবচেয়ে বেশি ঘটে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সৌদি আরব। তৃতীয় অবস্থানে আছে ওমান। এক্ষেত্রে কাতারের অবস্থান চতুর্থ। ক্রমবর্ধমান তালাকের এই সংখ্যা সংশ্লিষ্ট মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

এ ধরণের আরেকটি রিপোর্ট ২৯ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে AmarSpot.com নামের একটি বাংলা ব্লগ সাইটে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়, সৌদি আরবের 'দাহরান' অঞ্চলের একদল কলেজ ছাত্রী বিত্তবান ও সুস্থ পুরুষদের প্রতি একই সময়ে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুরোধ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগের সাইট টুইটারে 'পুরুষদের প্রতি বহুবিবাহের আহ্বান' শিরোনামে প্রচার অভিযান শুরু করেছে। কারণ সৌদি আরবে মেয়েদের চিরকুমারী থাকার সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশটিতে এ ধরণের নারীর সংখ্যা ২০১২ সালে ১০ লাখে উন্নীত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সৌদি আরবের অর্থনীতি ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জরিপে দেখা গেছে, দেশটিতে ২০১১ সালে ৩০ বছর বয়সী অবিবাহিত নারীর সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ ২৯ হাজার ৪১৮ জন। অর্থনৈতিক সংকট এবং বিয়ের জন্য পুরুষদেরকে বিপুল অর্থ-সম্পদ যৌতুক হিসেবে দেয়ার ব্যয়বহুল প্রথা সৌদি মেয়েদের অবিবাহিত থাকার সবচেয়ে বড় দুটি কারণ।

রিপোর্টদ্বয়ের মাধ্যমে আরব সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ এবং

আরবদের মধ্যে গরিব-ধনীর ব্যবধান ও অপচয়

আরেকটি কষ্টদায়ক বাস্তবতা হচ্ছে, বস্তুবাদী পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে আরবজাতির মধ্যে আয়েশ-আরাম, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতি গুরুত্বারোপ, আনন্দ-ফূর্তি, সাজসজ্জা ও লোক দেখানো উদ্দেশ্যে অপচয়ের দৃঢ় অভ্যাস গড়ে উঠেছে। সমাজে ভোগ-বিলাস ও অপচয়ের পাশাপাশি দারিদ্রতা, ক্ষুধা এবং অশ্লীলতাও রয়েছে। কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি আরবের বড় বড় শহরে দৃষ্টিপাত করলে তার চোখ অশ্রুসজল এবং লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসবে। সে দেখতে পাবে– একদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোক, যারা তাদের উদ্ধৃত্ত সম্পদ ব্যয় করার খাত খুঁজে পাচ্ছে না। আর অন্যদিকে এমন বেদুইন দিনদরিদ্র শ্রেণী, যাদের কাছে মজুদ নেই এক বেলার খাবার। নেই শরীর ঢাকার মতো পোশাক-পরিচ্ছদ। অথচ আরবের বিত্তবান ও ধনী ব্যক্তিরা বায়ুবেগের অভিজাত গাড়িতে ভ্রমণ করে বেড়ায়। আর দুয়েক পয়সার জন্যে তাদের গাড়ির পেছনে ছুটতে থাকে ছেঁড়া-ফাটা খণ্ড বস্ত্র পরিহিত হাড্ডিসার শিশুদের একটি পাল। এটাই কি আরবদের সেই সোনালী ও আদর্শ সমাজ???

যতদিন আরব দেশগুলোতে উৎকৃষ্ট গাড়ি ও আকাশচুম্বী অট্টালিকার পাশাপাশি জীর্ণশীর্ণ বস্তি ও সংকীর্ণ-অন্ধকার ঝুপড়ি থাকবে। যতদিন ক্ষুধা-দারিদ্রতা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সেখানে সমাজতন্ত্রের (Communism) আন্দোলনও থাকবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতেই থাকবে। কোনো শাক্তি বা প্রচার মাধ্যম দ্বারা তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। যদি পূর্ণাঙ্গ ও উত্তমরূপের ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সেখানে আল্লাহর শাস্তিস্বরূপ জালেম ও স্বৈরশাসকের শাসন কায়েম হবেই।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা

ইসলামীবিশ্ব ও আরববিশ্বের জন্যে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, কৃষি-শিল্প-প্রযুক্তি ও শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীন ও

এসব ক্ষেত্রে পশ্চিমাবিশ্বের অনুকরণের বিষয়টি তাদের জন্যে আরও বেশি মারাত্মক ক্ষতির কারণ। এই সংকট থেকে উত্তরণের একটিই উপায়। তা হচ্ছে, আরবদেরকে আবারও পরিপূর্ণ ইসলামে ফিরে আসতে হবে [বাকারা, ২: ২০৮]। ইসলামের উপর পূর্ণাঙ্গ আস্থা রাখতে হবে। তবেই তাদের দুনিয়া ও আখিরাত সুখময় হবে এবং পুনরায় অর্জিত হবে বিশ্বনেতৃত্ব।

স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া জরুরি। তারা শুধু ওইসব জিনিস ব্যবহার করবে, যা সেখানে উৎপাদিত হয় কিংবা তাদের শিল্পকর্মের ফলে প্রস্তুত হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমাবিশ্ব থেকে অমুখাপেক্ষী হতে হবে। নিজেদের সকল প্রয়োজন নিজেরাই মেটাবে। খাদ্য-বস্ত্র-অস্ত্র, যুদ্ধের সরঞ্জাম ও মেশিনারি ইত্যাদি নিজেরাই প্রস্তুত করবে।[১] এসব ক্ষেত্রে পশ্চিমাবিশ্বের দয়ার পাত্র হওয়া যাবে না।

বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে, আরববিশ্ব যদি কোনো কারণে পশ্চিমাবিশ্বের সাথে যুদ্ধ করতে চায় তাহলে সে পশ্চিমাবিশ্বের ঋণী এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। সে যেই কলমটি দিয়ে পশ্চিমাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে তাও কোনো পশ্চিমা দেশের প্রস্তুতকৃত। পশ্চিমাদের সাথে যুদ্ধ করলে সে যেই গুলি ব্যবহার করবে তাও পাশ্চাত্যের কারখানায় তৈরি। আরববিশ্বের সবচেয়ে বড় মর্মান্তিক ঘটনা (Tragedy) হচ্ছে, সে তার সম্পদের ভাণ্ডার ও শক্তির উৎস (খনিজ তেল ইত্যাদি) থেকে নিজে উপকৃত হতে পারেনি। বরং জীবন চালনার রক্ত তার শিরা-উপশিরা হয়ে পশ্চিমাবিশ্বের শরীরে পৌঁছে থাকে। তার সেনাবাহিনীর ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব পালন করে পশ্চিমাবিশ্বের সেনা অফিসার ও এজেন্টরা। সরকারি বিভিন্ন বিভাগের প্রধান পদে পশ্চিমারাই দায়িত্বরত। আরববিশ্বকে নিজেদের সকল প্রয়োজন ও চাহিদার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থব্যস্থা, আমদানি-রপ্তানি, ছোট-বড় শিল্প, ভারি মেশিনারি, যুদ্ধের অস্ত্র-সরঞ্জাম প্রস্তুত এবং সৈনিকদের ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া জরুরি। এমন ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যারা সরকারি দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত এবং দক্ষতা ও আমানতদারির সাথে দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

---

১. আমদানি করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে কোনো মুসলিম দেশ থেকে আমদানি করবে। এতে নিজেদের প্রয়োজনও মিটবে এবং অপর মুসলমানকে আর্থিক সহযোগিতা করার সাওয়াবও পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে অমুসলিম দেশ থেকে আমদানি করা হলে এ দ্বারা অমুসলিমরা আর্থিকভাবে সাবলম্বী হবে। আর এই লাভের অর্থ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। এমনকি তাদের প্রস্তুতকৃত খাবারে হারাম বস্তু সংমিশ্রণের সন্দেহও রয়েছে। তাছাড়া অর্থনীতির নিয়ম হচ্ছে, আমদানিকে নিরুৎসাহ করতে হবে। দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ এবং দেশীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। [অনুবাদক]

মানবজাতির কল্যাণে আরবদের কোরবানী

মানবতার নিষ্ঠুরতা ও দুর্ভাগ্য যখন সীমাহীন পর্যায় পৌঁছেছিল, তখন এ ধরায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব হয়। তখন মানবতার সংস্কার ও পরিশুদ্ধি ওইসব ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সম্ভব ছিল না, যারা ছিল আয়েশ-আরামের জীবনে অভ্যস্থ। মেহনত-পরিশ্রম, কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা এবং জান-মালের ক্ষতি মেনে নেয়ায় অভ্যস্থ ছিল না। তখন মূলত এমন ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন ছিল, যারা মানবজাতির কল্যাণে নিজেদের ভবিষ্যত জীবন বিসর্জন দিতে পারে। ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি ত্যাগ করে জান-মাল ও পার্থিব ক্ষতির আশঙ্কা মেনে নিয়ে সংকট মোকাবিলা করতে পারে। নিজেদের পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা যেকোনো প্রকারের আর্থিক ক্ষতি বা আশঙ্কার পরোয়া করে না। তাদের সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের (পার্থিব) স্বপ্ন ভঙ্গ করতে দ্বিধা বোধ করে না। আত্মীয়-স্বজনরা এরূপ কথাই বলে থাকে যেমনটি হযরত সালেহ আ.কে তাঁর সম্প্রদায় বলেছিল। কুরআন মাজীদের ভাষায়:

قَالُوْا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا ○

"তারা বলল, হে সালেহ! ইতিপূর্বে তোমার কাছে
আমাদের বড় আশা ছিল।"[১]

যে পর্যন্ত এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুজাহিদ প্রস্তুত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানবতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। কোনো মহান দাওয়াতও সফলকাম হবে না। এমন উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হাতে গোনা কয়েকজন হয়ে থাকে মাত্র। তাদেরকে সামাজিক সংস্কার ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ ভাবা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের উপর মানবজাতির সফলতা ও সুখ-শান্তি নির্ভরশীল। তারা তাদের প্রাণ বাজি রেখে সহস্র মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। অকল্যাণ থেকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসেন। যদি কতিপয় ব্যক্তির ত্যাগ-তিতিক্ষা পুরো জাতির জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও জান-মালের সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে অসংখ্য মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার সফলতার দ্বার উন্মুক্ত হয় তাহলে এটা কোনো ক্ষতিই নয়, বরং বড় প্রাপ্তি।

---

১. সূরা হূদ, ১১: ৬২

একজন দায়ীকে যেমন হতে হবে

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যখন নবী করে পাঠানো হয়ন তখন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানতেন যে, রোম-ইরান ও অন্যান্য সভ্য জাতিরা– যারা তৎকালীন বিশ্বের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল– আদৌ আয়েশ-আরাম ছেড়ে শান্তির জীবন ঝুঁকিতে ফেলবে না। অসহায় মানবতার সেবা, দাওয়াত ও জিহাদের জন্যে বিপদাপদ ও কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার শক্তি তাদের নেই। তারা লৌকিকতা ও বিলাসিতার জীবন এক মুহূর্তের জন্যেও পরিত্যাগ করবে না। তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না, যে নিজের রিপু, লোভ-লালসা দমন করে প্রচলিত রীতি-নীতি পরিহার করেছিল কিংবা শুধু প্রয়োজন পরিমাণ জীবন উপকরণে সন্তুষ্ট ছিল। এজন্যই ইসলামের দাওয়াত এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সংশ্রবের জন্যে এমন জাতি নির্বাচিত করা হয়েছে, যারা দাওয়াত ও জিহাদ এবং কোরবানী ও আত্মত্যাগে ছিল উজ্জীবিত। তারা ছিল সরল, পরিশ্রমী ও শক্তিশালী আরবজাতি। তারা কৃত্রিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং পার্থিব চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না। এরাই হলেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম। যারা ছিলেন অন্তরের ধনী, জ্ঞানে পরিপক্ব এবং লৌকিকতা থেকে বহু দূরে।

রসূলুল্লাহ স. এর আত্মত্যাগ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইসলামের মহান দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের পরিপূর্ণ হক আদায় করেছেন। এই দাওয়াতকে তিনি প্রত্যেক ওই জিনিসের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যা এতে কোনো প্রকারের বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে। তিনি ছিলেন প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বহুদূরে। পার্থিব চাকচিক্য তাঁকে মোহিত করতে পারেনি। এ মহা গুণটিই হচ্ছে গোটা বিশ্বের জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ (Best Ideal) ও সরল পথের দিশা।[১]

---

১. তাইতো আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ২১) তিনি মুসলমানদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উত্তম আদর্শ এবং সর্বাধিক মহব্বতের পাত্র। যদি তাই হয় তাহলে মুসলিম জাতি বর্তমান পরিস্থিতি

কুরাইশ গোত্রের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে ওই সকল মোহনীয় জিনিসের প্রস্তাব দিয়েছিল, যা একজন যুবক ও জৈবিক চাহিদার পূজারীকে আকৃষ্ট করে থাকে। যেমন– সিংহাসন ও রাজত্ব, আয়েশ-আরাম এবং ধন-সম্পদ। কিন্তু তিনি এসব প্রস্তাব দ্বিধাহীনচিত্তে প্রত্যাখ্যান করলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তাঁর চাচা দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, "হে চাচাজান! আল্লাহর কসম, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবুও আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকবো না, যতক্ষণ না ইসলাম জয়যুক্ত হয়ে যায় অথবা এ পথে আমি নিঃশেষ হয়ে যাই।"

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এরূপ আত্মত্যাগ, পার্থিব সুখ-শান্তি বিমুখতা এবং শান্তিময় জীবনের উপর কষ্টময় জীবনকে প্রাধান্য দেয়া দায়ীদের জন্যে চিরন্তন নমুনা (Ideal) হয়ে আছে। তিনি বিসর্জন

থেকে নিজেদেরকে উদ্ধার করতে পারছে না কেন? কেন আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না? মুসলমানরা যদি প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে, তবেই ইসলাম পুনর্জাগরিত হবে এবং তারা পুনরায় ফিরে পাবে বিশ্বের শাসন ক্ষমতা। তাদের বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত শান্তি। মুসলমানদেরকে বিশ্বের নেতৃত্ব দানের কথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ○

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন।" (সূরা নূর, ২৪: ৫৫)

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৩৯)

সুতরাং বিশ্বপরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন মুসলিম জাতি যদি সাহাবায়ে কেরামের গুণে গুণান্বিত হয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ নিয়ে সামনে এগিয়ে চলে তাহলে তারা অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই বিজয়ী হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবে। এর জন্য সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র হচ্ছে, "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দুনিয়াত্যাগী ও আখেরাতমুখী হতে হবে।" [অনুবাদক]

দিয়েছিলেন সকল প্রকারের পার্থিব আয়েশ-আরাম ও সুখ-শান্তি। শুধু নিজেই নয় বরং তাঁর পরিবার, বংশধর এবং আত্মীয়-স্বজনকেও সুখ-শান্তি ভোগ করতে দেননি। যে যত বেশি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটবর্তী ছিল সে ততই আয়েশ-আরাম ও সুখময় জীবন থেকে দূরে এবং জিহাদ ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। তিনি কোনো জিনিস নিষিদ্ধ (হারাম) করার ইচ্ছা করলে নিজ সম্প্রদায় ও আত্মীয়-স্বজনদের থেকে শুরু করতেন। পক্ষান্তরে কোনো প্রাপ্য বা সুবিধা ঘোষণার সময় দূরবর্তী লোকদের থেকে শুরু করতেন। এমনকি অনেক সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং নিজ সম্প্রদায়ের লেকেরা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন সুদ নিষিদ্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন সর্বপ্রথম নিজের চাচা হযরত আব্বাস র. এর প্রাপ্য সুদ রহিত করলেন। তেমনিভাবে যখন জাহেলী যুগের প্রতিশোধপ্রথা বাতিল করার ঘোষণা করলেন তখন রবীআ ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের খুনের প্রতিশোধ সর্বপ্রথম মাফ করলেন। আর যখন যাকাতের বিধান (যা ছিল কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত একটি আর্থিক সুবিধা) চালু করলেন তখন তা নিজ সম্প্রদায় বনী হাশেমের জন্যে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব র. বনী হাশেমের জন্যে হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানোর পাশাপাশি কাবাঘরের চাবি রাখার সম্মানিত দায়িত্ব পালনের দাবি করেছিলেন, যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং উসমান ইবনে তালহা র.কে ডেকে কাবাঘরের চাবি দিয়ে বললেন, "হে উসমান! এই নাও তোমার চাবি। আজ অনুগ্রহের দিন। এ চাবি চিরকাল তোমাদের বংশেই থাকবে। কোনো জালেম ব্যতীত কেউই তোমাদের থেকে এ চাবি কেড়ে নেয়ার দুঃসাহস দেখাবে না।"

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে দুনিয়া বিমুখতা (যুহদ), অল্পে তুষ্টি ও সাদামাটা জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, তোমরা যদি অভাব-অনটনের জীবন যাপন করতে পার তবেই আমার সংশ্রব গ্রহণ করো। আর

যদি পার্থিব ধন-সম্পদ ও আয়েশ-আরাম চাও তবে, তা আমার কাছে নেই। তিনি আল্লাহ তা'আলার এ ইরশাদ পাঠ করে শোনালেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝۲۸ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۲۹

"হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[১]

তবে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকেই বেছে নিলেন। তেমনিভাবে হযরত ফাতিমাতুয যাহরা র. যখন শোনতে পেলেন যে, হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে কিছু গোলাম ও খাদেম এসেছে। এদিকে চাক্কিতে আটা পেষতে পেষতে তাঁর হাতে যখম পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি প্রিয় পিতার নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে একজন খাদেম প্রদান করেন। এতে আমার কিছু কষ্ট লাঘব হবে। উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে কিছু তাসবীহ ও তাহমীদ (তাসবীহে ফাতেমী) শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন, এগুলো তোমার জন্য খাদেমের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। আত্মীয়-স্বজন ও নিকটবর্তীদের সাথে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আচরণ এমনই ছিল। অর্থাৎ যে যত বেশি তাঁর নিকটবর্তী হতো তার দায়দায়িত্ব হতো তত বেশি।

মক্কাবাসীদের ঈমান গ্রহণের পর তাদের জীবনে আর্থিক ধস নেমে আসে। অনেকের ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান হয়। এমনকি সারা জীবনের সঞ্চয়কৃত ব্যবসার মূলধনও হারাতে হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ভোগ-বিলাস ও আরামপ্রিয় ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তারাই সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের সকল উপকরণ ধ্বংস করে দিলেন। ইসলামের দাওয়াত দিতে এবং এ পথের বাধা-বিপত্তি দূর

১. সূরা আহযাব, ৩৩: ২৮

করতে গিয়ে অনেকের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়েছে।

ঠিক তেমনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং আনসার তাঁর সংশ্রব গ্রহণ করলেন, তখন এর প্রভাব তাদের খেত-খামারে পড়েছে। তারা এগুলো পরিচর্যার সময় চাইলে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۝

"আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।"[১]

আরবদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী প্রত্যেকের অবস্থা এমনই হয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও জান-মালের ক্ষতি সাধনে তাদের অংশ ছিল এত বেশি যে, পৃথিবীতে তাদের সমকক্ষ কোনো জাতি নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ٭ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

"আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর– আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"[২]

---

১. সূরা বাকারা, ২: ১৯৫
২. সূরা তাওবা, ৯: ২৪

আরও ইরশাদ হয়েছে:

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ○

"মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহ'র সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা।"[১]

তা এজন্য যে, মানবজাতির কল্যাণ তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই সাধিত হওয়া সম্ভব ছিল। তাই তাদেরকে এভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেন মুহাজির ও আনসার অবস্থার পরিবর্তন, সামাজিক বিপ্লব এবং মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে সর্বোচ্চ কোরবানী পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ○

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে।"[২]

আরও ইরশাদ করেন:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?"[৩]

আরবজাতি যদি এই সফলতা গ্রহণে এবং মানবতার এ মহান সেবা দানে দোদুল্যমান হতো তাহলে পৃথিবীর হানাহানি ও দূর্বস্থা আরও দীর্ঘায়িত হতো এবং জাহেলী যুগের অন্ধকারে পৃথিবী এখন পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হতো।

---

১. সূরা তাওবা, ৯: ১২০
২. সূরা বাকারা, ২: ১৫৫
৩. সূরা আনকাবূত, ২৯: ২

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

اِلَّا تَفۡعَلُوۡهُ تَكُنۡ فِتۡنَةٌ فِي الۡاَرۡضِ وَفَسَادٌ كَبِيۡرٌ ○

"তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।"[১]

রসূলুল্লাহ স. এর আবির্ভাবকালে পৃথিবীর অবস্থা

ষষ্ঠ ঈসায়ী শতাব্দীতে পৃথিবী এক অশুভ ও সংকটময় সময় পার করছিল। তখন আরবদের সামনে দুটি পথ ছিল। (১) হয়তো তারা নিজেদের জান-মাল, সন্তান-সন্তুতি ও প্রিয় বস্তু সম্পর্কে সকল আশঙ্কা গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যাবে। লোভ-লালসা সংযত রেখে, পার্থিব চাকচিক্যে মোহিত না হয়ে বৃহত্তর মানবকল্যাণের স্বার্থে নিজেদের সবটুকুই বিসর্জন দিবে। তবেই পৃথিবীর অবস্থা ও মানবতার ভাগ্য পরিবর্তন হওয়া সম্ভব ছিল। তারা এ পথটিই অবলম্বন করেছে। ফলে চারদিকে ঈমানের সুবাতাস বয়ে গেল এবং জনমনে জান্নাত লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো। অথবা (২) তারা প্রবৃত্তির চাহিদা, ব্যক্তিস্বার্থ এবং ব্যক্তিজীবনের আয়েশ-আরামকে মানবকল্যাণের উপর অগ্রাধিকার দিবে। এমতাবস্থায় পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পথভ্রষ্টতার শিকার হতো।

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা মানবতার মঙ্গল চেয়েছিলেন। এজন্য আরবদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদের মধ্যে ঈমান ও আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা এবং আখেরাতের অফুরন্ত নেয়ামতের আগ্রহ সৃষ্টি করলেন। এর ফলে তারা মানবকল্যাণের জন্যে নিজেদেরকে পেশ করেন। পার্থিব আয়েশ-আরাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের জান-মাল আল্লাহর পথে ঢেলে দিলেন। ওই সকল জিনিস বিলীন করে দিলেন, যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তারা পরিপূর্ণ ইখলাস ও খাঁটি মনে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে প্রাণের মতো প্রিয় জিনিসটুকুও বিসর্জন দিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বিশ্বনেতৃত্ব দান করেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন। وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন)।

---

১. সূরা আনফাল, ৮: ৭৩

আজ পৃথিবী আবারও সেস্থানে পৌঁছেছে যেখানে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ছিল। মানবজাতি আবারও সেই দোমাথা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবকালে ছিল। সুতরাং আবারও আরবজাতির মাঠে নামার এবং পৃথিবীর ভাগ্য বদলাতে জান-মাল উৎসর্গ করার প্রয়োজন। পার্থিব ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তির উপকরণ পরিত্যাগ করে পৃথিবীকে বিপদমুক্ত করা তাদের একান্ত কর্তব্য।

আরেক অবস্থা হচ্ছে, আরবরা উচ্চাভিলাষ ও তুচ্ছ চাহিদা পূরণ, পদ-মর্যাদা ও আয়-রোজগার বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের ধ্যানে মগ্ন থাকবে। আয়েশ-আরামের উপকরণ একত্রিত করায় ব্যস্ত থাকবে। এর পরিণামে পৃথিবী ওই বিষক্ত পুকুরে হাবুডুবু খেতেই থাকবে, যাতে যুগ যুগ ধরে পতিত। শিক্ষিত আরব যুবকরা যদি ইচ্ছার পরাধীন (প্রবৃত্তির গোলাম) হয়ে যায়। আর তাদের জীবনের উদ্দেশ্য পেট ও পদার্থ (ধন-সম্পদ)[১] হয় এবং জীবনের সকল প্রচেষ্টা ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে হয়ে থাকে তাহলে এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা মানবকল্যাণ আশা করা যায় না। বরং জাহেলী যুগের কতক যুবকরা তাদের চেয়ে বেশি সাহসী ও আধুনিক ধ্যান-

---

১. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা (General Syllabus) মূলত উপযুক্ত কর্মজীবী এবং দক্ষ কর্মচারী তৈরির মাধ্যম মাত্র। এজন্যই এ শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম বা প্রকৃত জ্ঞানের কোনো ছোঁয়া নেই। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিম দেশের একই অবস্থা। সেখানকার জনগণ শুধু জীবন-জীবিকা আর বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে। আর ইসলামকে জীবনযাত্রার ঐচ্ছিক বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিতদের জীবনধারা দেখে মনে হয়, তারা শিক্ষা অর্জন করছে ভালো চাকরি পাওয়ার জন্যে; দক্ষতার সাথে চাকরি করার জন্যে। যাতে করে প্রিয় জীবনটি আয়েশ-আরাম ও সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হয়। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কী ঘটবে তা নিয়ে ভাবার সময় নেই তাদের। বিষয়টি যদি এমন না হতো তাহলে, তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের ছোঁয়া থাকবে না কেন? কর্মশিক্ষায় তো বিশ বছর ব্যয় করা হচ্ছে। অথচ ধর্মশিক্ষায় দু'একটি বছর বা দুয়েক মাসও ব্যয় করা হচ্ছে না। ফলে মুসলিম সমাজে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের কারণে, পারস্পরিক অনাস্থা এবং শিষ্টাচারের অভাবে জীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত। তাদের জীবনের সারসংক্ষেপ হচ্ছে, তারা চাকরি করে সংসার করে আর সংসার করে চাকরি করে। এই গণ্ডির বাইরে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। দিনরাতের বরং গোটা জীবনের রুটিনটাই যেন রোবটের মতো। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করে বহু আগেই আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বলেছিলেন, "ধর্মহীন কর্মশিক্ষা আর কর্মহীন ধর্মশিক্ষা জাতির জন্যে বোঝা হয়েছে।" সুতরাং এই বাস্তবসম্মত বাণীটি সামনে রেখে স্কুল-মাদরাসার উভয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা উচিত। [অনুবাদক]

ধারণার অধিকারী ছিল। তারা নিজেদের প্রিয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে জীবনের সকল সুখ-শান্তি এমনকি উজ্জ্বল ভবিষ্যত পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করত না। জাহেলী যুগের কবি ইমরুউল কায়েস বর্তমান আরব যুবকদের চেয়ে বেশি সাহসী ছিলেন। তিনি বলেন:

ولو أنني أسعى لأدنى معيشة　　كفاني ولم أطلب قليلا من المال

ولكنما أسعى لمجد مؤثل　　وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

> "আমি যদি সামান্য জীবন উপকরণের জন্যে চেষ্টা করতাম তাহলে সামান্যতম সম্পদ আমার যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমি তা চাইনি। —— বরং আমি তো চিরন্তনের মহাসম্মান সন্ধানকারী। আর আমার মতো যুবকরাই এমন মর্যাদা অর্জন করতে পারে।"

বিশ্বব্যাপী কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে অত্যাবাশ্যকীয় হলো, মুসলমান যুবকদের সকল প্রকার আত্মত্যাগের মাধ্যমে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে। সেই সেতু পার হয়েই পৃথিবী শান্তির জীবন খুঁজে পাবে। যেমনিভাবে উত্তম ফসলের জন্যে জমির সারের প্রয়োজন। তেমনিভাবে মানবতার ভূমিতে উপযুক্ত সার দরকার। এ দ্বারা ইসলামের গাছটি ডাল-পালা মেলে দিনদিন বেড়ে উঠবে। আর তা হচ্ছে, ইসলামী জাগরণ এবং বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম যুবকদেরকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-চাহিদা, লোভ-লালসা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ মানবকল্যাণের জন্যে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি-উন্নয়ন ও আয়েশ-আরামের উপকরণ পরিত্যাগ করতে হবে। সকল মুসলমান বিশেষ করে আরবজাতিকে তা করতেই হবে। মুষ্টিমেয় মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে যদি গোটা মানবতা মুক্তি পায়; গোটা মানবতা জাহান্নামের পথ ছেড়ে জান্নাতের পথের পথিক হয়ে যায়। তবে এটা সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে অনেক বড় প্রাপ্তি। কেননা এর মাধ্যমে যে নেয়ামত অর্জন হবে তা অত্যন্ত মূল্যবান এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে যতই কোরবানী দেয়া হোক না কেন তা খুবই নগণ্য। কবি বলেন:

اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں

اِک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں

হে আমার মন! ভালোবাসায় পুরোটাই লাভ।

মাত্র একটি প্রাণের ক্ষতি, এটি কোনো ক্ষতিই নয়!

আরববিশ্বের কাছে ইসলামীবিশ্বের চাওয়া

আরববিশ্ব তার বৈশিষ্ট্যসমূহ, ভৌগোলিক অবস্থান[১] ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে ইসলামের দাওয়াত এবং পুনর্জাগরণের দায়িত্ব পালনে অগ্রাধিকার রাখে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আরববিশ্বই ইসলামীবিশ্বের

---

১. যেমন– (১) আরববিশ্ব হচ্ছে সকল নবী-রসূলের আগমনস্থল। কোনো কালেই আরববিশ্বের সকল মানুষ পথভ্রষ্ট হয়নি। বরং সর্বকালে তাদের মধ্যে সত্যবাদী ও হকপন্থী একটি দল ছিল। (২) মক্কা-মদীনা, বাইতুল্লাহ, মসজিদে নববী, রওজায়ে রসূল এবং বাইতুল মুকাদ্দাসসহ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত পবিত্র স্থানসমূহ আরব ভূখণ্ডেই অবস্থিত। (৩) মক্কা পৃথিবীর মধ্যখানে অবস্থিত। এখান থেকেই বিশ্বব্যাপী ইসলামের আলো ছড়িয়েছিল। আজ পৃথিবীর সংকটময় সময়ে আবারও এখান থেকেই ইসলামী জাগরণের সূর্য উদিত হওয়া উচিত। তেমনিভাবে মক্কাকে কেন্দ্র করে গ্রীনিচমান সময়ের পরিবর্তে মক্কামান সময় চালু করা উচিত। এ দ্বারা প্রতি মুহূর্তে মক্কা ও ইসলামের পবিত্র অনুভূতি মানব হৃদয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তেমনি মক্কাকে কেন্দ্র করে মুসলিম দেশগুলোর জন্যে মুসলিম জাতিসংঘ ও গোল্ড দীনার প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এ দ্বারা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, যা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে ও আপসে সহযোগিতার মনোভাব প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে। (৪) **সুয়েজ খাল:** একশ' এক মাইল দীর্ঘ এই খালের সাথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উন্নয়ন সম্পৃক্ত। ইউরোপের উন্নত দেশগুলির সমৃদ্ধি দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। এক. মধ্যপ্রাচ্যে তেলের পর্যাপ্ত সরবরাহ। দুই. এশীয় বাজারে পণ্য সরবরাহের সহজ যোগাযোগের মাধ্যম সুয়েজ খাল। তেমনিভাবে এশিয়ার দেশগুলো ইউরোপ থেকে আমদানি ও নিজেদের শিল্পায়নের জন্যে সুয়েজ খালের উপর নির্ভরশীল।

সুয়েজ খাল আরববিশ্ব ও ইসলামীবিশ্বের একটি মহাসম্পদ। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। বিশ্ববাণিজ্যে এর অবদান অপরিসীম। মুসলিমবিশ্ব এর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে। এ জলপথে যাতায়াতকারী জাহাজের উপর শুল্ক আরোপের দ্বারা মিসর আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারে এবং বিশেষ নজদারির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই খালের সাথে সম্পৃক্ত মুসলিম স্বার্থবিরোধী যেকোনা কর্মকাণ্ড প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা ইসলামীবিশ্বের শুধু অধিকারই নয় বরং বিশেষ দায়িত্বও বটে। দৃঢ় ও সতর্ক কলা-কৌশল অবলম্বন করা হলে এটি অমুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি হাথিয়ারের কাজ দিবে। অর্থাৎ মুসলিম স্বার্থকে ধুলিসাৎ করা হলে এই খালে অমুসলিমদের জাহাজ প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। সেক্ষেত্রে পুরো আফ্রিকা মহাদেশের কয়েক হাজার মাইল সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা এশিয়ার কোনো মুসলিম দেশে আক্রমণ বা বাণিজ্য করার স্বপ্নও দেখবে না। =

সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে। পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রহণের পর পরিশ্চমাবিশ্বের সাথে পাল্লা দিতে পারে। ঈমানী শক্তির বলে এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে তাদের বিপক্ষে বিজয় লাভ করতে পারে। পৃথিবীকে অকল্যাণ থেকে কল্যাণের পথে, ধ্বংস ও দুর্দশা থেকে নিরাপত্তা ও শান্তির পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। পশ্চিমাবিশ্বের সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে পারবে, যেমনটা মুসলমানদের দূত পারস্য সম্রাটের দরবারে বলেছিলেন:

> "আমরা মানবতাকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে এক আল্লাহর ইবাদাতে রত করতে চাই। পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে বের করে স্বাধীন করতে চাই। নানা ধর্মের অবিচার থেকে বের করে ইসলামের সুবিচারের অধীনস্থ করতে চাই।"

মানবজাতি আজ ইসলামীবেশ্বর দিকে নিজেদের উদ্ধারকারী হিসেবে চেয়ে আছে। আর ইসলামীবিশ্ব আরবশ্বিকে নেতৃত্ব দানকারী ও পথপ্রদর্শক বিশ্বাস করে। ইসলামীবিশ্ব কি মানবজাতির এ আশা ও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে? আর আরববিশ্ব কি ইসলামীবিশ্বের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে? নিপীড়িত ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত মানবতা কয়েক যুগ ধরে মুসলমানদের নিকট মিনতি করে আসছে। তাদের বিশ্বাস যাদের হাতে পবিত্র কাবাঘর নির্মিত হয়েছিল, তারাই এ পৃথিবীর সংস্কার করতে (পুনর্জাগরণ ঘটাতে) সক্ষম। তাদের এ অনুভূতি প্রাচ্যের কবি আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল রহ. এভাবে তুলে ধরেছেন:

ناموسِ ازل را تو امینی تو امینی — دارائے جہاں را تو یساری تو یمینی!

اے بندۂ خاکی تو زمانی تو زمینی — صہبائے یقین در کش واز دیر گماں خیز

ازخوابِ گراں خوابِ گراں خوابِ گراں خیز

ازخوابِ گراں خیز

= বিশ্বের বেশির ভাগ মুসলিম দেশগুলো নদীর তীরে অবস্থিত। এসব দেশের নদী ও বন্দর ব্যবহার করে ইউরোপ-আমেরিকা মুসলমানদের তরল স্বর্ণ পেট্রোল গ্রাস করে যাচ্ছে। পেট্রোল, গ্যাস ও মুসলমানদের খনিজ সম্পদ পানির দরে ক্রয় করে তারা অতি লাভবান হচ্ছে। আবার এ ব্যবসার টাকা মুসলমানদেরকে চড়া হারে সুদি ঋণ দিচ্ছে। মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে ব্যয় করছে। মুসলমানরা যদি সচেতন হতো এবং তাদের জীবন-মরণ এক আল্লাহর জন্যে হতো তাহলে মুসলমানদের কোনো সম্পদ, নদীপথ বা আকাশপথ ইউরোপ-আমেরিকা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে পারত না। [অনুবাদক]

فریاد از افرنگ و دلآویزئ افرنگ　　فریاد ز شیرینیٔ و پرویزئ افرنگ
عالم ہمہ ویرانہ ز چنگیزئ افرنگ　　معمارِ حرم باز بہ تعمیرِ جہاں خیز!
از خوابِ گراں خوابِ گراں خوابِ گراں خیز
از خوابِ گراں خیز

হে মুসলিম! তুমিই শাশ্বত সম্মানের অধিকারী;
তুমিই বিশ্বজগতের নিবেদিত সেবক।
হে মাটির মানুষ! যামানা তোমার, জগত তোমার;
বুতখানা ছেড়ে তাওহীদী হও, দৃঢ়বিশ্বাসী হও।
জেগে উঠো, জেগে উঠো;
গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠো।

ইংরেজদের ছল-চাতুরী নিপাত যাক;
কখনও লায়লী আবার কখনও মজনু সাজে।
ইংরেজদের চেঙ্গিজি ধ্বংসযজ্ঞে বিশ্ব আজ বিধ্বস্ত;
হে কা'বার নির্মাতা! আবারও বিশ্বের বিনির্মাণ করো।
জেগে উঠো, জেগে উঠো;
গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠো।

ও৪ ৪০ও৪ ৪০
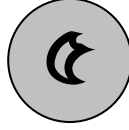
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

আরব জাতীয়তাবাদ আরববিশ্বের জন্য মারাত্মক শঙ্কা

অনুবাদ ও গ্রন্থনা

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

আরেফবিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ও
শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর সংশ্রবপ্রাপ্ত

—— ঃ প্রকাশনায় ঃ ——

বাইতুল কিতাব

১৮/১৩, ব্লক–এইচ, মিরপুর–১, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৫১১ ৯৪২৯৬৫, ০১৭১৪ ৩২৩২৯৬

প্রথম প্রকাশ (একত্রে): ফেব্রুয়ারি ২০১৩

পরিবেশনায়

দারুল হাদীস	মাকতাবাতুয যাকারিয়া
দোকান নং- ২৪, ইসলামী টাওয়ার	বাসা- ৩২, ব্লক- ডি
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭৩০ ৯৯৫৭৭২	মোবাইল : ০১৭১২ ৯৫৯৫৪১

মুহাম্মাদে আরাবী–ই আরববিশ্বের পরিচয়

یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس اُمت کو　　وصالِ مصطفوی، افتراقِ بولہبی
نہیں وجود حدود و ثغور سے اِس کا　　محمدِ عربی سے ہے عالمِ عربی

এই সূক্ষ্মদর্শিতা কোনো উম্মতকে শেখানো হয়নি;
অর্থাৎ রসূলুল্লাহ'র সংশ্রব গ্রহণ আর আবু লাহাবদের বর্জন।
সীমান্ত-প্রান্তে ঘেরা ভূখণ্ড আরববিশ্ব নয়;
মুহাম্মাদে আরাবী–ই আরববিশ্বের মূল পরিচয়।

[কবি সম্রাট আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল রহ.]

مسلم خوابیدہ اٹھ، درماں بکن چارہ بساز
ایک عالم تیری جانب دیکھتا ہے بار بار

জাগো হে ঘুমন্ত মুসলিম! বিশ্বকে বিপদমুক্ত করো;
গোটা বিশ্ব তোমার পানে চেয়ে আছে।

[মুফতী মুহাম্মাদ ইসহাক সিদ্দীকী নদভী রহ.]
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা

❀ ❀ ❀

ভূমিকা

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

ইসলামীবিশ্বে যত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা একটি নতুন জীবনব্যবস্থা ও একটি নতুন ধর্মের রূপ গ্রহণ করে। ইসলামের জন্যে চ্যালেঞ্জস্বরূপ আত্মপ্রকাশ পায়। আর ওই পুরো ভূখণ্ডটি গ্রাস করতে চায়, যা দীর্ঘকাল ধরে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় শাসিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী মতবাদে আসমানী ধর্মের ন্যায় আকীদা-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, ভালোবাসা-ঘৃণা, গ্রহণ-বর্জন এবং আবেগ-উদ্দীপনা সবকিছুই আছে। যারা দ্বীনের সাথে মহব্বত এবং দ্বীনের সঠিক বুঝ রাখেন তারা শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদী মতবাদকে ইসলামের শত্রু ও প্রতিপক্ষ ভেবে আসছেন। তারা মনে করেন এ আন্দোলনের ফলে ইসলামী ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং সর্বত্র নাস্তিকতা ছড়িয়ে পড়বে। এজন্যই তারা নিজেদের দায়িত্ব মনে করে এর বিরোধিতা করে থাকেন। এক্ষেত্রে তুর্কী, ইরান, কুরদী ও আফগানী জাতির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহ একই ধাঁচের। সেজন্যেই সেখানকার সঠিক আকীদার অধিকারী মুসলমানরা এর জোরালো বিরোধিতা করেন এবং জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের সকল মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে এ শ্লোগান দিলেন:

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○

"এই যে তোমাদের জাতি — তারা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত করো।"[১]

১. সূরা আম্বিয়া, ২১: ৯২

তবে আরব জাতীয়তাবাদ (Arabic Nationalism) এসব জাতীয়তাবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তুর্কী, ইরানী, কুরদী ও আফগানী জাতীয়তাবাদ ছিল ইসলাম ধর্ম ছেড়ে ভিন্ন পথাবলম্বনের শামিল। কিন্তু আরববিশ্ব শুধু ধর্মের নয় বরং ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু এবং ইসলামের সর্বপ্রথম দায়ী ও পথপ্রদর্শক ছিল। এ ভূখণ্ডটি ছিল ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু, শান্তির নীড় ও আশ্রয়স্থল। তাদের জাতীয়তাবাদী মতদাব গ্রহণ করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াতের ধারক-বাহক হওয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট জাতির (البعث العربى এর) মুখপাত্রে পরিণত হওয়া একটি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা (Historical Crisis)। বিভিন্ন জাতির জাতীয়তাবাদী মতবাদ গ্রহণ করা নিশ্চয়ই পথভ্রষ্টতা। কিন্তু আরবদের জাতীয়তাবাদী হওয়া শুধু পথভ্রষ্টতা নয় বরং ধর্ম বিকৃতি এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করার নামান্তর। এজন্য ইসলামীবিশ্বে ব্যাকূলতা-অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ইসলামী চিন্তাবিদ ও দ্বীনদার শ্রেণীর ঘুম হারাম হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু চিত্রটি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এই ভয়ানক বিষয়ে কোনো গুরুত্বারোপ করা হয়নি। দ্বীনদার শ্রেণীর এরূপ অবস্থা সম্পর্কে ষষ্ঠ হিজরীতে হাকীম সানায়ী গজনবী রহ. অভিযোগ করে বলেছিলেন:

گرفتہ چینیاں احرام ومکی خفتہ در بطحا

হজ্বের উদ্দেশ্যে হাজীরা ইহরাম বেঁধেছে,
আর মক্কাবাসীরা মক্কায় ঘুমন্ত।

দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে এ বিষয়ে দুশ্চিন্তা-অস্থিরতা সৃষ্টি হয়নি কেন? যারা সামান্যতম ভ্রান্তি সহ্য করতে পারেন না তারা এত বড় ভ্রষ্টতা সহ্য করেন কীভাবে? এমনকি অধিকাংশ সময় তারা পথভ্রষ্ট (জাতীয়তাবাদী) নেতৃবৃন্দের (যেমন– কামাল আতা তুর্ক, জামাল আবদুন নাসির, সাদ্দাম হোসেন প্রমুখের) প্রসংশায় পঞ্চমুখ হন। দুটি কারণে এমন হয়ে থাকে:

এক. আরব জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মূল মতবাদ ও আসল ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে তারা খুবই কম অবগত। হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য, যারা আরব জাতীয়তাবাদের মূল কিতাবাদি (Literature) অধ্যয়ন করেছেন। এখানকার পত্র-পত্রিকায় আরব

জাতীয়তাবাদী নেতাদের যেসব বক্তব্য প্রকাশিত হয় তা দ্বারা তাদের মূল ধ্যান-ধারণা বোঝা সম্ভব নয়। এগুলোর বেশির ভাগই তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য মাত্র। সুতরাং এদেশের দ্বীনদার শ্রেণী যদি তাদের সম্পর্কে অনবগত হয় এবং তাদের সম্পর্কে সুমত পোষণ করে থাকে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা তারা জানেন না আরব জাতীয়তাবাদের মূলে কী রয়েছে? উদ্দেশ্য কী? এর মধ্যে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতা কতটুকু? মধ্যপ্রাচ্যের ওইসব নেতৃবৃন্দের ভক্ত ও তাদের লেখায় প্রভাবিত শিক্ষিত যুবকদের ধ্যান-ধারণা কী? তাদের মুখ ও কলম দ্বারা কীরূপ মতামত প্রকাশ পায়? وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ "আর যা কিছু তাদের অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য।"[১]

দুই. কোনো পশ্চিমা শক্তির (আমেরিকা-ব্রিটেনের) দিকে চোখ রাঙিয়ে দেখা কিংবা মোকাবিলা করার দাবি করা অথবা ইসরাইলের জুলুম-নির্যাতন থেকে ফিলিস্তীনকে স্বাধীন করার মৌখিক ইচ্ছা পোষণ করার কারণে সাধারণ লোকেরা আরব জাতীয়তাবাদী নেতাদের ভুল-ভ্রান্তি-ভ্রষ্টতা ভুলে যায়। পশ্চিমা শক্তির অতীত ও বর্তমান কুচিত্র, ইসলামী দেশগুলোর সাথে তাদের শত্রুতামূলক আচরণের প্রেক্ষাপটে এবং ইসরাইলের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে কোনো ইসলামী বা আরব রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দৃঢ়প্রত্যয় এবং যুগ যুগ ধরে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ না থাকার কারণে জনসাধারণ আরব জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং البعث العربى (Ba'ath Party) এর মতো নাস্তিক সংগঠনের নেতাদেরকে মুসলমান এবং আরবদের উদ্ধারকারী মনে করে থাকে। এ কারণে তাদের ত্রুটি-ভ্রান্তিসমূহও দৃষ্টিগোচর করা হয়। অথচ তারা শুধু আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তারা দ্বীনকে মূল্যায়ন করে না। ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও দায়-দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে থাকে। এমনকি এর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করে। তারা আরবজাতি ও আরব দেশগুলোকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাহেলী যুগে ফিরিয়ে নেয়ার নীল নকশা
বাস্তবায়ন করতে চায়। সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, এমনকি শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাও তাদের পক্ষে শ্লোগান দিতে থাকে। আর ওইসব

১. সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১৮

ব্যক্তিবর্গ ও দলের নিন্দা করে থাকে, যারা বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত। যারা জাতীয়তাবাদী ও বাথ নেতাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত। যারা ভালো করে জানেন যে, জাতীয়তাবাদী নেতারা ইহুদী-খ্রিস্টানদের চক্রান্তের শিকার এবং তারা আরবজাতিকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাহেলী যুগ ও (ধর্মহীন) আরব জাতীয়তাবোধের সাথে যুক্ত করতে চায়।

জাতীয়তাবাদের সমালোচক হকপন্থী দলের চিরন্তন নীতি হচ্ছে, তারা পার্থিব জীবনের সফলতাকে ততটা গুরুত্ব দেননি যতটা দ্বীনকে ক্ষতি ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বীনের ক্ষতি সাধন করে অর্জিত রাজত্বও তারা গ্রহণ করেননি। উলামায়ে কেরাম ও সংগ্রামী ব্যক্তিবর্গের পুরো ইতিহাস এরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণে পরিপূর্ণ। যদি এমন না হতো তাহলে এ দ্বীন খ্রিস্টবাদের ন্যায় এবং এ ধর্ম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় বহু আগেই বিকৃত হয়ে যেত। কিন্তু ওইসব উলামায়ে কেরামের বদৌলতে দ্বীন সকল প্রকারের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষিত রয়েছে, যাঁরা প্রত্যেক যুগে كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে।"[১] এই নির্দেশ পালন করেছেন এবং كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ "জালেম শাসক সম্মুখে সত্য কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ।"[২] এর মতো মহান জিহাদের সৌভাগ্য অর্জন করেছন।

লিপিকারের ওইসব জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোর পরিকল্পনা ও নীল নকশা পর্যবেক্ষণ করা, তাদের বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা, ওইসব দেশে বারবার ভ্রমণ করা ও দীর্ঘকাল ধরে অবস্থান করার এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে পরিচিত হওয়ার সরাসরি সুযোগ হয়েছে। জাতীয়তাবাদী এসব সংগঠন ইসলামের সাথে আরবদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে চায়। অথচ ইসলামই আরবদের মূল সম্পদ। তারাই ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বকালের দায়ী। আর এক্ষেত্রে তাদের নমুনা (Ideal) হওয়া দরকার। অধম এ বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা-ভাবনা ও অধ্যয়ন করে আসছে।

---

১. সূরা মায়েদা, ৫: ৮

২. সুনানে আবু দাউদ, ৪/১২৪, হা. নং ৪৩৪৪; জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ

এলগ্নে ইরাকে বাথ পার্টির কমিউনিস্ট নেতা সাদ্দাম হোসেনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তার জোরালো দাবিসমূহ, দুঢ় প্রত্যয় ও বীরত্ব প্রকাশের কারণে বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে তার সমর্থন বেড়েছে। এ সমর্থন কোনো চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা বা অধ্যয়নের ফলে সৃষ্টি হয়নি। বরং সম্পূর্ণ আবেগ-উত্তেজনা ও হুজোগের কারণে হয়েছে। লিপিকার নিজের দায়িত্ববোধ করে স্বলিখিত কয়েকটি আরবী প্রবন্ধ ও ইতিহাস অধ্যয়নের সারসংক্ষেপ পাঠক সমীপে তুলে ধরেছে। এতে ওইসব আন্দোলন ও সংগঠনের পটভূমি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ফলাফল সম্পর্কে নিরপেক্ষ প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। আশা করি চলমান সংকটময় অবস্থাতেও এটি অধ্যয়নের সময় বের করে এর যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে ইনশা আল্লাহ।

وما التوفيق الا من عند الله

আবুল হাসান আলী নদভী
১৫ রজব ১৪১১ হি.
১ম ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ঈ.

আরবদেরকে নির্বাচিত করার হিকমত

ইসলামের দাওয়াত, প্রচার-প্রসার এবং প্রথম নেতৃত্বদানকারী হিসেবে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা আরবদেরকে নির্বাচিত করেছেন। যেভাবে বনী ইসরাইলের জন্য ইরশাদ হয়েছিল:

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ○

"আমি জেনেশুনে তাদেরকে বিশ্ববাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।"[১] তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য ইরশাদ হয়েছে:

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ○

"আল্লাহ এ বিষয়ে সুপারিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে।"[২]

আরবদেরকে নির্বাচিত করার কী কারণ ছিল এবং কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের এ সম্মান লাভ হয়েছে– এই বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে গবেষকদের গবেষণার বিষয়বস্তু রয়েছে।[৩] বাস্তবতা হচ্ছে, প্রথম যুগের আরবরা ইসলামের মেজাজ বুঝতে, ইসলামী শিক্ষা সঠিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে আঁকড়ে ধরতে এবং ইসলাম বিরোধী প্রত্যেক বস্তু পরিত্যাগ ও প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে অতুলনীয় উদ্দীপনা প্রদর্শন এবং নজিরবিহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ইসলামের মূল (Principle) ও মেজাজ (Intention) রক্ষার্থে অসাধারণ সতর্কতা ও সততা অবলম্বন করেছেন। বিশ্ববাসীর মন জয় করে তাদের মস্তিষ্ক প্রভাবিত করার মাধ্যমে বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।

---

১. সূরা দুখান, ৪৪: ৩২

২. সূরা আন'আম, ৬: ১২৪

৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আল্লামা শিবলী নোমানী রহ. রচিত 'সীরাতুন্নবী' ১ম খণ্ড এবং লিপিকারের রচিত 'নবীয়ে রহমত' পৃ. ৫৯-৭২ অধ্যয়ন করুন।

আরব এবং ইসলামের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক

আল্লাহ তা'আলা আরব ও ইসলামের মাঝে একটি অবিচ্ছিন্ন (Informal) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং একের ভবিষ্যত অপরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো কিছুতে আরবদের সম্মান ও সফলতা অর্জন হতে পারে না। তদ্রূপ ইসলাম ততদিন সঠিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল যতদিন আরব এর ধারক-বাহক ও আহ্বায়ক ছিল।

আরব ও ইসলামের মাঝে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত এবং স্থায়ী করার বিষয়টি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অনেক গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আর এ উদ্দেশ্যে আরব ভূখণ্ডকে ইসলামের চিরস্থায়ী কেন্দ্র সাব্যস্থ করেছন। সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে তা দীর্ঘায়ু করার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু তথা রাজধানীকে সর্বদা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলামুক্ত হওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সুদূর প্রসারী নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রজ্ঞাপূর্ণ বহু অসিয়ত করেন এবং সেগুলো পূরণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে ওয়াদা ও শপথ গ্রহণ করেন।

হযরত আয়েশা র. এ সম্পর্কে বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বশেষ অসিয়ত ছিল, "لَا يَجْتَمِعُ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ" আরব ভূখণ্ডে যেন দুটি দ্বীন একত্রিত না হয়।[১]

আরব জাতীয়তাবাদের মূলে খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবী

আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পতাকাবাহী ও নেতৃত্ব দানে ছিলেন কতিপয় খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবী। যাদের তুর্কীদের সাথে ধর্ম-বিশ্বাস এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কোনোই মিল ছিল না। তারা ছিলেন পশ্চিমা সভ্যতার বাহক, যার ভিত্তি জাতিপূজা (Worship of Nation)

---

১. মুসনাদে আহমাদ ; মু'জামুল আওসাত লিত-তবরানী

দুটি দ্বীন একত্রিত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সেখানে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম যেন না থাকে। সাহাবায়ে কেরাম জান-প্রাণ দিয়ে এ অসিয়ত রক্ষা করে সেখানকার শান্তি বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু কয়েক যুগ ধরে আরবরা এ অসিয়ত রক্ষা করেনি, যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইরসাইলের জুলুম-নির্যাতন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। [অনুবাদক]

এবং জাতীয়তাবোধ (Nationalism)। এ আন্দোলনের প্রাথমিক লিডার ছিলেন ড. ফারিস নামির, শায়খ ইবরাহীম আলয়াযজী এবং উস্তায নাজীবুল আযুরী। তারা সকলে ছিলেন খ্রিস্টান এবং লেবাননের অধিবাসী।

আরবদের মধ্যে পশ্চিমা জাতীয়তাবোধের প্রচলন

এরপর পশ্চিমা জাতীয়তাবোধের যুগ শুরু হয়, যা একটি স্বতন্ত্র দর্শন (Philosophy) ও তত্ত্ব (Ism) ছিল। আর এতে একটি ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ, আবেগ-অনুভূতি, নিদর্শন ও পবিত্রতার মতো বিষয়বস্তুও ছিল। লেবাননের একজন মুসলিম লেখক আলী নাসিরুদ্দীন তার রচিত 'قضية العرب' (আরবীয় ইস্যু) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেন, "আরবীয় ইস্যু (Arabic Issue) একজন মুমিন, স্বাধীনচেতা, জ্ঞানী, সুশীল, ভদ্র, সাদামন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী আরবের নিকট ঈমানের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের জন্যে দেশের প্রতি ঈমান ততটুকুই গুরুত্বপূর্ণ যতটুকু আল্লাহর জন্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান।"[১]

আরব জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেন, "আরব জাতীয়তাবাদ নিরক্ষরতা, দারিদ্রতা, রোগ-ব্যাধি, অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতিসহ সকল সমস্যার মোকাবিলা করবে। দ্বীনদার শ্রেণীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করবে না। শুধু আরবজাতির পক্ষপাতিত্ব করবে। আরবদের জন্যে শিক্ষা হবে একটিই, তারা যেন দুটি জিনিসের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক তরফদারি করে। এক. নিজ জাতির জন্যে। দুই. সত্য ও ন্যায়ের জন্যে।"

এই লেখক 'العروبة' (আরবীয় একত্বতা) এর ব্যাখ্যায় স্পষ্ট ভাষায় লিখেন, "আরব জাতীয়তাবাদে দৃঢ়বিশ্বাসীদের নিকট 'العروبة' (আরবীয় একত্বতা) স্বয়ং একটি দ্বীন। কেননা এটা ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের বহু আগ থেকেই পৃথিবীতে প্রচলিত এবং এতে আসমানী ধর্মের ন্যায় আচার-ব্যবহার ও ফযীলত বিদ্যমান রয়েছে।"

---

১. [نعوذ بالله من ذلك] একটু ভেবে দেখুন, এটা কত বড় মারাত্মক কথা! ঈমান বিধ্বংসী ও ইসলাম বিরোধী মতবাদ। প্রকৃতপক্ষে আরববিশ্বে প্রকৃত শান্তি তখনই ফিরে আসবে যখন তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বশেষ অসিয়ত পালন করবে। অন্যথায় তাদের অনৈক্য বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের উপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বাড়তেই থাকবে। [অনুবাদক]

এই কথাটি বহু আগে উমর ফাখোরী তার রচিত 'كيف ينهض العرب؟' (আরবজাতি কীভাবে উন্নতি লাভ করবে?) গ্রন্থে লিখেছেন। তিনি লিখেন, "আরবজাতি ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না আরব জাতীয়তাবাদ তাদের ধর্মে পরিণত হয়। আর এ জাতীয়তাবাদের জন্যে ততটাই আবেগপূর্ণ ও আত্মসম্ভ্রবোধসম্পন্ন হতে হবে যতটা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কুরআনের জন্যে মুসলমান, ঈসা আ. এর ইঞ্জিলের জন্যে খ্রিস্টান ও ক্যাথোলিক, লুথারের শিক্ষার জন্যে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং রুসূর গণতান্ত্রিক নীতির জন্যে ফ্রান্সের বিপ্লবীগণ আবেগপূর্ণ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এতটাই গোঁড়ামি দেখাতে হবে যেমন সেন্ট পিটারের ডাকে ক্রুসেডাররা দেখিয়েছিল।"

আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মধ্যপ্রাচ্যের খ্রিস্টানদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল

আরব মুসলমান মূলত মধ্যপ্রাচ্যের ওইসব অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রের শিকার, যারা সংখ্যালঘু কিন্তু অতি চালাক, চতুর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। যাদের ভবিষ্যত শুধু আরব জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব ও উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত। তারা শুধু এ পথ ধরেই আরববিশ্বের নেতৃত্ব অর্জন করতে পারে এবং ইসলামীবিশ্বের সাথে আরববিশ্বের সম্পর্ক ছিন্ন করতে সক্ষম হবে। দ্বীনী আকীদা ও ইসলামী ইতিহাসের ক্ষেত্রে আরববিশ্বের সাথে এ সংখ্যালঘুদের কোনোই মিল নেই। এ বিষয়টি বোঝার জন্য এতটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট যে, বাথ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মহা-পরিচালক ছিলেন 'প্রফেসর মাইকেল আফলাক' (Michel Aflaq–ميشيل عفلق)[১] নামক একজন সিরীয় খ্রিস্টান, যাকে মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় চিন্তাবিদ ও দার্শনিক মনে করা হয়।

---

১. 'প্রফেসর মাইকেল আফলাক' হলেন বাথ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও মহা-পরিচালক। তিনি ছিলেন সিরীয় খ্রিস্টান। তবে জীবনের শেষাংশে ইরাকে প্রত্যাবর্তন করেন। বাকি জীবন সম্মান ও দৃঢ়তার সাথে সেখানেই কাটান। সাদ্দাম হোসেন তার যথার্থ মূল্যায়ন করেন। ২৩ জুন, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ, ইরাকে তার ইন্তেকাল হয়। মৃত্যুপূর্বে তার ইসলাম গ্রহণের কথা সম্ভবত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছিল। একজন আরব লেখকের মতে তিনি (মাইকেল আফলাক) ইন্তেকালের পর মুসলমান হয়েছেন।

অমুসলিম দার্শনিকরা জাতীয়তাবাদী মতবাদকে যেভাবে দর্শনরূপে তীক্ষ্নতা ও পাণ্ডিত্বের সাথে রচনা করেছেন এবং এতে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মনোভাব সৃষ্টি করেছেন; একজন আরব শিক্ষিত যুবক যেভাবে উৎকৃষ্টতার ধ্যানে মগ্ন এবং আরব জাতীয়তাবাদে আকৃষ্ট তা মাইকেল আফলাক রচিত 'في سبيل البعث' (পুনর্জাগরণের পথে)[১] গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দ্বারা অনুমান করা যায়। গ্রন্থটিকে আরব জাতীয়তাবাদের 'পবিত্র কিতাব' (صحيفة) বলা হলে বেশি সঠিক হবে। প্রফেসর মাইকের আফলাক লিখেন:

"ইসলামের বিজয় লাভে এত বিলম্ব এজন্য হয়েছিল, যাতে আরববিশ্ব নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সাথে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা, আশা-নিরাশা, সফলতা ও ব্যর্থতার পরীক্ষার ফলে বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ এ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে যাতে ঈমান তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয় এবং তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে জীবনের গভীরতার সাথে সম্পৃক্ত বাস্তবতার রূপ গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিকোণে ইসলাম একটি আরবীয় আন্দোলন মাত্র, যার উদ্দেশ্য ছিল আরবদের সংস্কার ও তাদের পূর্ণাঙ্গকরণ। সুতরাং এ গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক যুগে ইসলামের দাবি হচ্ছে, আরবদেরকে সমুচ্চ করতে ও তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক শক্তি ব্যয় করা উচিত এবং সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুধু আরব জাতীয়তাবাদের জন্যে হবে।"

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন শুরু থেকেই আরব জাতীয়তাবাদের প্রসিদ্ধ সংগঠন 'বাথ পার্টি'র সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এ সংগঠনের সভাপতি ছিলেন সিরিয়ার বাসিন্দা উপরোক্ত খ্রিস্টান প্রফেসর মাইকেল আফলাক। জীবনের শেষ দিনগুলো ইরাকে কাটিয়েছেন তিনি। সমকালীন সময়ে তার ইন্তেকাল হয়েছে। এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৩ সালে এবং ১৯৪৭ সাল ছিল এর যৌবনকাল। এ সংগঠনের মৌলিক চিন্তাধারা হচ্ছে, আরববিশ্ব একটি একক বা ঐক্যের নাম। তাদের মধ্যে দ্বীন, আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা এবং রাজনীতির যে ভিন্নতা রয়েছে তা সাময়িক। আর এসব ভিন্নতা আরব জাতীয়তাবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। এ আন্দোলন ও সংগঠনের শ্লোগান হচ্ছে,

---

১. গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হবে যে, মিসরের আরব জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ও নেতারাও মাইকেল আফলাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং তার শিষ্যস্বরূপ।

"العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة" অর্থাৎ আরবরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি, দীর্ঘস্থায়ী পয়গামের বাহক।

এই আন্দোলন আরবদেরকে ইসলাম পূর্ববর্তী (জাহেলী) যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। যখন তাদের কাছে ছিল না কোনো সঠিক দ্বীন। আঁহযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো পয়গাম বা শরীয়তও ছিল না। এ সংগঠন জাহেলী যুগের কুখ্যাত ব্যক্তিদেরকে নিজেদের হিরো (Ideal) মনে করে থাকে। আরব জাহেলী সাহিত্য ও ইতিহাসে যাদের সুনাম রচিত, তাদের নাম প্রচার-প্রসারে এরা গর্বিত হয়। এর পরিচালকরা ইসলামকে পশ্চাতে ফেলে নিজেদের জীবনধারার জন্যে নতুন নীতিমালা ও জীবনবিধান তৈরি করেছে, যা স্বাধীন আরব জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক ও জৈবিক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর গঠনতন্ত্রে ইসলামের নাম পর্যন্ত নেই। গবেষক ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিবর্গ ভালো করেই জানেন, এটা খ্রিস্টান-ক্রুসেডারদের একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং এর মাধ্যমে তারা ইসলামের সাথে আরবদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। এর প্রভাব সিরিয়ার মতো ইসলামের উজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী রাষ্ট্রে হাফিজ আল-আসাদের (বাথ পার্টির নেতা) সরকারে লক্ষ্য করা যায়। সেখানে নির্দ্বিধায় মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। উলামা ও দ্বীনদার শ্রেণীকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরব জাতীয়তাবাদের প্রভাব কুয়েতেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এ আশঙ্কা প্রত্যেক ওইসব দেশে রয়েছে যেখানে জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিদ্যমান। মাইকেল আফলাক তার প্রসিদ্ধ 'نضال البعث' (জাগরণের সংগ্রাম) গ্রন্থে লিখেন:

"আরবজাতি সভ্যতার একটি একক। তাদের মধ্যে সকল মতভেদ সাময়িক ও মূল্যহীন, যা আরব মতবাদের জাগরণে একাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আরবজাতির নিকট একটি স্থায়ী পয়গাম রয়েছে, যা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং নতুন নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। মানবতার মূল্যায়ন ও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে পরস্পরে সহযোগিতার উৎসাহ যুগিয়েছে।[১]

---

১. 'نضال البعث' (জাগরণের সংগ্রাম), ১/১৭৩

এর অর্থ হলো, আমরা এক আরবজাতি। বাহ্যিকভাবে এমন মনে হয় না যে, এ জাতি ইসলামের কারণে সংগঠিত হয়েছে। এমন মনে করা তো ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পশ্চাতগামিতার মনোভাব দৃঢ় করার শামিল এবং এর অর্থ দাঁড়ায়, আমাদের কোনো দ্বীনী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। অথচ আমরা তা চাই না। বরং জীবনের পথ পরিবর্তন ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে আরব জাতীয়তাবাদী দলের পদ্ধতিই হচ্ছে মূল পদ্ধতি।"[১]

আরব জাতীয়তাবাদের বিরোধিতার মূল কারণ

আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে দ্বীনদার শ্রেণীর আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়। বরং উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা এর যুক্তিযুক্ত হওয়া প্রমাণিত। এসব উদ্ধৃতি ওই সকল সচেতন মানুষকে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতায় উৎসাহ যোগায়, যারা এর দূরবর্তী ফলাফল ও প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যারা আরববিশ্বকে ইসলামী দাওয়াতের মূল পুঁজি এবং ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু ও ঘাটি মনে করেন। যারা জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে পশ্চিমাদের ব্যাখ্যা দ্বারা অবগত এবং এ মতবাদকে দ্বীনের প্রতিপক্ষ, শত্রু ও নাস্তিক্যবাদের অগ্রদূত মনে করেন। যারা বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং প্রাচীন পারস্য কবির ভাষায় বলে থাকেন:

چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی؟

কুফর যদি মক্কা থেকে সৃষ্টি হয় তবে,
ইসলাম পাওয়া যাবে কোথায়?

অন্যান্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তুলনায় আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বেশি মারাত্মক ও ভয়ানক এজন্য যে, তারা আরববিশ্বকে প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রতি, তাদের তৎকালীন পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে চায়। অথবা সে যুগের প্রতি অন্তত অবজ্ঞা ও ঘৃণা হ্রাস করতে চায়। অথচ সেযুগকে কুরআন কুফরের আদর্শযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং সেযুগের মন্দত্ব ও কদর্যতা বিভিন্ন রূপে বর্ণনা করেছে। কুরআন মাজীদ যখন কোনা আমল, চিন্তাধারা এবং চারিত্রিক অবক্ষয়ের অনিষ্টতা ও

---

১. 'نضال البعث' (পুনর্জাগরণের পথে), পৃ. ২৪৪

কদর্যতা, তার দোষ-ত্রুটি এবং অপছন্দনীয় হওয়ার বর্ণনা করে তখন ইসলাম পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের দিকে সম্বোধন করে থাকে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ○

"একদল জাহেলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে।"[১]

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ○

"তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফয়সালা কামনা করে?"[২]

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ○

"তোমরা জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।"[৩]

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ○

"কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ (গোত্রীয় অহমিকা) পোষণ করত।"[৪]

তেমনিভাবে উক্ত মনোভাব দ্বারা ওইসব কাফের-মুশরিক নেতাদের প্রতি ঘৃণা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে, যারা সরাসরি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোকাবিলা এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধচারণ করেছে। তাদের মধ্যে মূর্খতাযুগের পক্ষপাতী এবং সেযুগের পক্ষ হতে প্রতিরোধের মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলাফল ঈমান ধ্বংস হওয়া এবং নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, সমকালীন সময়ে আরব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে এই প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে যে, মুসলিম ইতিহাসবিদরা জাহেলী যুগকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বদনাম করেছেন। আরববিশ্বের কয়েকটি দেশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মন্ত্রণালয়ের রচনা বিভাগে এমন আন্দোলনও চলছে যে, জাহেলী ও জাহেলীযুগ (العصر الجاهلي) শব্দের পরিবর্তে 'প্রাচীন আরব' অথবা 'ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে'র পরিভাষা

---

১. সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৪
২. সূরা মায়িদা, ৫: ৫০
৩. সূরা আহযাব, ৩৩: ৩৩
৪. সূরা ফাতাহ, ৪৮: ২৬

প্রচার করা হোক। আরব জাতীয়তাবাদের উন্নয়নের ধারা যদি এভাবে অব্যাহত থাকে এবং এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তোলা না হয় তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয় যখন আবু জাহেল ও আবু লাহাবের পক্ষপাতিত্ব করা হবে। তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। আর বিভিন্ন জাতীয় কীর্তি ও উত্তম আরবীয় গুণাবলীর কারণে তাদেরকে জাতীয় বীর (National Hero) এবং আরবের উচ্চপদস্থ নেতা গণ্য করা হবে।

সহীহ হাদীসে ঈমানের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে যে, কুফরের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ধারণা করলেও শরীর শিউরে উঠবে এবং এমন ভীতি ও বিষণ্নতা অনুভব হবে যেমন আগুনে নিক্ষেপের ধারণা করলে হয়ে থাকে।[১]

জাতীয়তাবাদী এসব আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী অমুসলিম (খ্রিস্টান) নেতৃবৃন্দ, সাহিত্যিক ও লেখকদের প্রভাবে কুফর এবং কাফেরদের প্রতি ঘৃণা দিনদিন কম হতে চলেছে। পক্ষান্তরে ওইসব অনারব মুসলিম দেশ ও জাতির প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা জাতীয়তাবাদের বিরোধী কিংবা ভিন্ন ব্লকের অধিবাসী। উত্তর সাইপ্রাসে (Northern Cyprus)[২] প্রেসিডেন্ট নাসিরের তুর্কী মুসলমানদের পরিবর্তে রোমান খ্রিস্টানদের সহযোগিতা ও সামরিক সাহায্য প্রদান এবং কতক আফ্রিকান সরকারের পক্ষপাতিত্ব দ্বারা, যারা অতি নির্মমভাবে সেদেশের মুসলিম নাগরিকদের বংশসহ হত্যা করেছে– উক্ত বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

এসব স্পষ্ট কারণ ও যুক্তি, যা শুধু আশঙ্কা নয় বরং বাস্তব ঘটনা– এর ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম ও সমাজের চিন্তাশীল শ্রেণীকে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষপাতিত্ব করা কিংবা কোনো জাতীয়তাবাদী নেতার প্রশংসা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। বরং প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বীন ও শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্ব পালনার্থে এর বিরোধিতা এবং প্রতিবাদ করতে হবে।

---

১. সহীহ বুখারী, অধ্যায় 'ঈমানের পরিচয়'

২. তুর্কী প্রজাতন্ত্র উত্তর সাইপ্রাস (Turkish Republic of Northern Cyprus) নয় বছর পর্যন্ত গ্রীসের দখলে থাকার পর তুর্কী সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে ১৯৮৩ সালে প্রজাতন্ত্র সাইপ্রাস (Republic of Cyprus) থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তুর্কী ব্যতীত কোনো দেশ উত্তর সাইপ্রাসকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি।

ইতিপূর্বে ইসলামের সাথে আরবদের সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা

প্রথম : যাকাত অস্বীকার ও নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি

ইসলামের সাথে আরবদের সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদেরকে জাহেলী যুগে ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র ইতিহাসের নতুন কোনো ঘটনা নয়। আরববিশ্ব বিভিন্ন প্রকারের দুর্বলতা, আকীদাগত ও চারিত্রিক সমস্যায় জর্জরিত থাকা সত্ত্বেও দৃঢ়প্রত্যয়ী, কঠোর পরিশ্রমী এবং সামরিক গুণের অধিকারী একটি জাতি। গোটা আরববিশ্বের খাঁটি একত্ববাদের আহ্বায়ক হওয়া এবং মানবতাকে মানুষের দাসত্ব (চাই তা শাসক গোষ্ঠির দাসত্ব হোক, দ্বীনী নেতৃবৃন্দ বা ধর্মজাজকের) থেকে মুক্তিদাতা এবং দ্বীনের ধারক-বাহক হয়ে যাওয়া পার্শ্ববর্তী দেশ ও সরকারগুলোর জন্যে বড় চ্যালেঞ্জ ও ভয়ের কারণ ছিল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহলোক ত্যাগের বেশিদিন অতিবাহিত না হতেই আরব ভূখণ্ডের পূর্বাংশে ধর্মত্যাগের (ارتداد) ঘটনা ঘটে। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন যাকাতের বিধানকে অস্বীকার করা হয় এবং কতক লোক[১] নবুওয়াতের দাবি নিয়ে মাঠে নামে। সদ্য প্রকাশিত একটি দ্বীনের জন্যে এটা একটি বড় ধরণের অগ্নিপরীক্ষা ছিল, যার কোনো নজীর দ্বীন ও ধর্মের ইতিহাসে নেই। বহু ইতিহাসবিদ এ ফেতনার ভয়াবহতা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক অপশক্তির যোগসাজশের পরিপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেননি। সমকালীন সময়ে কতক গবেষক ও ইতিহাসবিদের গবেষণায় বিষয়টি ফুটে উঠেছে যে, এ ফেতনার প্রসারের ক্ষেত্রে ইহুদী-খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। যখন তারা লক্ষ্য করল যে, এতকাল ধরে আরব ভূখণ্ডে তারা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বরং গোটা আরববিশ্বে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার একমাত্র দ্বীন ও ঈমানে পরিণত হয়, যার ফলে

১. মুসায়লামা কাজ্জাব, আসওয়াদ আনসী, তুলাইহা, সাজ্জাহ এবং লাকীত ইবনে মালিক আল-আযদী প্রমুখ।

আশেপাশের বায়জেন্টাইন তথা রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যও ভীত-আতঙ্কিত হয়। এজন্য তারা এ 'ধর্মত্যাগের ফেতনা'কে নিজেদের হাথিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করে এবং এর উৎসাহ যোগায়।[১]

কিন্তু এটা মূলত দ্বীনকে বিশ্বব্যাপী প্রচার এবং দীর্ঘস্থায়ী করার একটি আয়োজন ছিল মাত্র। এর মোকাবিলা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বপ্রথম খলীফা হযরত সিদ্দীকে আকবার র.কে নির্বাচিত করেন। যার কোনো তুলনা দ্বীন বা ধর্মের ইতিহাসে নেই। কোনো নবীর এমন নায়েব (স্থলাভিষিক্ত) ছিল না। তিনি এ ফেতনার মোকাবিলায় যে দৃঢ়সংকল্প, শক্তি ও দৃঢ়তার প্রদর্শন করেছেন, তা তাঁর একটি বাক্য দ্বারা প্রমাণ হয়। তিনি বলেছিলেন, "أَيُنْقَصُ الدِّيْنُ وَأَنَا حَيٌّ" অর্থাৎ এটা কীভাবে সম্ভব যে, আমি জীবিত থাকা সত্ত্বে দ্বীনের মধ্যে কমতি করা হবে? তাঁর এ বাক্যটি একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাবের স্থলাভিষিক্ত, যা দ্বারা তাঁর মনোবল প্রকাশ পায়। ফেতনাটি তিনি স্বমূলে উৎখাত করেন এবং এর ফলে আরব ভূখণ্ড ও আরবজাতি সেই আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের ঐক্যমতে ফিরে আসে, যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে ছিল। এখন সেই ফেতনা এবং তার ইতিহাস একটি পরিত্যক্ত ঘটনা মাত্র। হযরত আবু হুরায়রা র. উক্ত ঘটনাটি উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "ওই আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। যদি হযরত আবু বকর র. খলীফা না হতেন তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত হতো না।" তিনি এ কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন।[২]

দ্বিতীয় : ফিলিস্তীন ও বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ

ধর্মত্যাগের উক্ত ফেতনার পর আরব ভূখণ্ড এবং এর পার্শ্ববর্তী দেশ ও পবিত্র স্থানসমূহের জন্যে সবচেয়ে বড় মারাত্মক আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র ছিল ক্রুসেডার ও পশ্চিমা শক্তিধর দেশগুলোর ফিলিস্তীন ও বাইতুল মুকাদ্দাসের

---

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য অধ্যয়ন করুন: ড. জামীল আবদুল্লাহ মিসরী রচিত আধুনিক গবেষণামূলক গ্রন্থ 'أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري' (প্রথম হিজরী শতাব্দীর ফেতনাসমূহ এবং অভ্যন্তরীন যুদ্ধে ইহুদী-খ্রিস্টানদের প্রভাব ও অংশ), পৃ. ১৭৪-১৮০, ১৯৮৯ ঈ. সালে প্রকাশিত।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৩০৪

উপর আক্রমণ। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে (৪৭০ হি.) এ আক্রমণ হয়েছিল, যা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে (৫৮৩ হি.) সমাপ্ত হয়। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, গোটা ইউরোপ ও খ্রিস্টানবিশ্বের যৌথ আক্রমণের উদ্দেশ্য শুধু মসজিদে আকসা ও ফিলিস্তীন দখল করা ছিল না। বরং আরব ভূখণ্ড ও মক্কা-মদীনা দখল করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারীদের মুখ থেকে মদীনা মুনাউওয়ারা ও রওজায়ে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে যেসব অসৎ উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ পেয়েছে তা কোনো মুসলমানের কলম অনুলিপি করতে পারবে না। তখন ফিলিস্তীন, সিরিয়া এবং এর পার্শ্ববর্তী দেশগুলো ক্রুসেডার ও পশ্চিমাবিশ্বের যৌথ আক্রমণের মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ইতিহাসবিদ সট্যানলে লেনপোল (Stanley Lane Poole) লিখেন, “ক্রুসেডার বাহিনী বিভিন্ন দেশে এত সহজে ঢুকে পড়েছিল যেমন কোনো পুরনো কাঠে লোহার খিল। মনে হচ্ছিল, ইসলাম নামক গাছটি কেটে এর তক্তা বানানো হবে।”[১]

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা শুধু সিরিয়া ও ফিলিস্তীন নয় বরং পুরো আরব ভূখণ্ডকে ক্রুসেডারদের হিংস্র আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং তাদের অসৎ ইচ্ছা পণ্ড করার লক্ষ্যে সিরিয়ার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নুরুদ্দীন জঙ্গীকে দাঁড় করান। তিনি ক্রুসেডারদের তাড়াতে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিজেকে আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত মনে করলেন। এ মহান খেদমতকে সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ভেবেছেন। তাঁর ধারাবাহিক আক্রমণে খ্রিস্টান দেশগুলোতে ভীতি সঞ্চারিত হয়। তিনি মিসরকে ক্রুসেডারদের দখলমুক্ত করে খ্রিস্টানদেরকে উভয় দিক থেকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার এবং ক্রুসেডারদের পূর্ণাঙ্গরূপে পরাজিত করার পূর্বেই ৫৬৯ হি. (১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে) সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী ইন্তেকাল করেন। তবে এ সৌভাগ্য তাঁর সেনাপ্রধান সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী[২] অর্জন করেন।

---

১. ইন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৬/৬২৭ পৃষ্ঠায় 'Crusades' প্রবন্ধ দেখুন।

২. সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পিতার নাম ছিল আইয়ুব। তাঁর দিকে সম্বোধন করে পুরো বংশকে আইয়ুবী বলা হয়। সুলতান সালাহুদ্দীন এবং তার পুরো বংশ কুরদী ছিল। এ বংশে

তাঁর মাধ্যমে এ মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়। বস্তুত সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ব্যক্তিত্ব রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবন্ত মোজেযা এবং ইসলামের সত্যতার দলীল। তিনি প্রত্যেক মুসলমানের কৃতজ্ঞতা ও দু'আ পাওয়ার উপযুক্ত। তাঁর জন্মই যেন হয়েছিল এ উদ্দেশ্যে। তিনি জিহাদ অত্যন্ত ভালোবাসতেন। জিহাদ ছিল তাঁর জন্যে আনন্দদায়ক এবং আত্মার খোরাক। তাঁর মধ্যে দ্বীনী সম্ভ্রমবোধ এত বেশি ছিল, যা এ ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। যখন হিত্তীনের চূড়ান্ত যুদ্ধ শেষে (৫৮৩ হি./১১৮৭ খ্রি.) ইউরোপের পরাজিত বাদশাহগণ ও নেতৃবৃন্দকে তাঁর সম্মুখে হাজির করা হয় তখন তিনি নিজের পাশে বসিয়ে তাদের আপ্যায়ন করেন। কিন্তু যখন রিজনাল্ডকে (Reginald) তাঁর নিকট আনা হয় তখন তাকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, "আমি তোকে দু'বার হত্যা করার শপথ করেছিলাম। প্রথমবার, যখন তুই মক্কা-মদীনার মতো পবিত্র শহরে আক্রমণ করতে চেয়েছিলি। আর দ্বিতীয়বার, যখন তুই ধোঁকা ও প্রতারণা করে হাজীদের কাফেলার উপর আক্রমণ করেছিলি।"[১]

তারপর সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁর তলোয়ার বের করে বললেন, "এই নাও, আমি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিশোধ নিচ্ছি।" এবং রিজনাল্ডের শিরচ্ছেদ করেন। এ ঘটনায় উপস্থিত বাদশাহগণ ও নেতৃবৃন্দ ভীত-কম্পিত হন। সুলতান সালাহুদ্দীন তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "একজন বাদশাহর জন্যে অপর বাদশাহকে হত্যা করা শোভা পায় না। কিন্তু সে মাত্রারিক্ত সীমালঙ্ঘন করেছিল। যাহোক, যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেছে।"[২]

যুগে যুগে উচ্চ মর্যাদাশীল মুজাহিদ, দ্বীনের দায়ী এবং অনেক আল্লাহওয়ালা-বুযুর্গ জন্মেছেন। এ বংশের কয়েক লক্ষ নিরীহ মানুষ ইরাকী বাথ নেতা সাদ্দাম হোসেন রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা এবং বোমা মেরে হত্যা করেছে।

১. কাজী ইবনে শাদ্দাদ বর্ণনা করেন, যখন ওই অসহায় হাজীরা রিজনাল্ডের কাছে মানবতার দোহাই দিয়ে দয়ার আবেদন করেন তখন সে অভদ্র ভাষায় বলেছিল, "তোমাদের মুহাম্মাদকে ডাকো, যেন তোমাদেরকে উদ্ধার করেন।" এ কথা সুলতান সালাহুদ্দীনের নিকট পৌঁছে। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, এই বেয়াদবকে বাগে পেলে স্বহস্তে হত্যা করবো। [সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, মুহাম্মাদ ফরীদ, পৃ. ১২৭]

২. সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, পৃ. ১৮৮

কাজী ইবনে শাদ্দাদ লিখেন, "সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে এত বেশি চিন্তিত ছিলেন যে, কোনো পাহাড়ও এ বোঝা বহন করতে সক্ষম ছিল না।"[১]

মুসলমানদের বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় এবং হিত্তীনের অপমানজনক পরাজয়ে ইউরোপের দেশগুলোতে রাগ ও প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে। গোটা ইউরোপ ছোট্ট সিরিয়ার উপর একযোগে আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে ইউরোপের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, বাদশাহ ও সেনাপতি অংশগ্রহণ করেন। সম্রাট ফ্রেডরিক (Friedrich), রিচার্ড (Richard) এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, সিসিলি, অস্ট্রেলিয়া, বারগান্ডি ও ফ্লান্ডারর্সের বাদশাহগণ তাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে মাঠে নেমে আসেন। অপরদিকে তাদের মোকাবিলায় শুধু সুলতান সালাহুদ্দীন এবং তাঁর কয়েকজন মুখলিস সাথি গোটা ইসলামীবিশ্বের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। পাঁচ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উভয় পক্ষ ক্লান্ত হয়ে যায় এবং সর্বশেষ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তাদের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধি অনুযায়ী বাইতুল মুকাদ্দাস এবং মুসলমানদের হাতে বিজিত শহর ও কেল্লাসমূহ সুলতান সালাহুদ্দীনের দখলে থাকে। সুলতান সালাহুদ্দীন ইসলামের যে খেদমত নিজের দায়িত্ব করে নিয়েছিলেন (উত্তম ভঙ্গিতে বললে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন) তা তিনি উত্তমরূপে পালন করেন। এ পবিত্র ও মহান দায়িত্ব পালন করে শুধু সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও আরব ভূখণ্ডই নয় বরং পুরো ইসলামীবিশ্বকে ক্রুসেডারদের (Crusaders) দাসত্ব থেকে রক্ষা করে ইসলামের এ শ্রেষ্ঠ কৃতিসন্তান ২৭ সফর ৫৮৯ হি. ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি একজন খাঁটি মুজাহিদ এবং সুফী-সাধক, অধিক ইবাদতকারী ও দুনিয়াত্যাগী বাদশাহ ছিলেন। ইন্তেকালের সময় তিনি এতটুকু সম্পদ রেখে যাননি, যা দ্বারা কাফন-দাফন সম্পন্ন করা যায়। কাফনের ব্যবস্থা তাঁর মন্ত্রী কাজী ফাজেল কোনো হালাল মাল দ্বারা করেছিলেন।[২] তাঁর উপর কখনও যাকাত ফরয হয়নি। কেননা তিনি এ পরিমাণ মাল একত্রিত করেননি, যার উপর যাকাত ফরয হয়।[৩]

---

১. আন-নাওয়াদেরুস সুলতানিয়া, পৃ. ২১৩
২. আন-নাওয়াদেরুস সুলতানিয়া, পৃ. ২৫১
৩. আন-নাওয়াদেরুস সুলতানিয়া, পৃ. ৫-১০

মূলকথা, আরব ভূখণ্ড ও পবিত্র স্থানসমূহ-ই নয় বরং যেকোনো ইসলামী রাষ্ট্রে ক্রুসেডারদের সামরিক আক্রমণ ও স্বাধীনচেতা ধ্যান-ধারণার মোকাবিলা করতে, মসজিদে আকসা ও পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষণ এবং ইসলামী শাসনের সোনালী যুগ ফিরিয়ে আনতে আবারও এ ধরণের উত্তম চরিত্র ও দৃঢ়প্রত্যয়ী ঈমানী শক্তির প্রয়োজন। আরববিশ্বে এই গুণের কমতি রয়েছে এবং তা ইসলামীবিশ্বেরও একান্ত প্রয়োজন। ''وَلَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا'' (হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো নতুন উপায় করে দেবেন)।[১]

তৃতীয় : মক্কার গভর্নরের উসমানী খিলাফতের বিদ্রোহ

ইসলামের ইতিহাসে আরব ভূখণ্ড ও পবিত্র স্থানসমূহের জন্যে তৃতীয় মারাত্মক আশঙ্কা তখন দেখা দিয়েছিল যখন মক্কার গভর্নর শরীফ হোসেন উসমানী খিলাফত ও তুর্কী সাম্রাজ্যের (Ottoman Empire)[২] বিদ্রোহ করে এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। তখন পশ্চিমা জোটের পক্ষ

---

১. সূরা তালাক, ৬৫: ১

২. **উসমানী খিলাফত:** তাতার সমরনায়ক হালাকু খানের মাধ্যমে আব্বাসী খিলাফতের পতনের পর ১২৮৮ সালে উসমানী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। হালাকু খান আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস করে দেয়। সে বছরই উসমানী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই উসমানী খিলাফতের সর্বপ্রথম খলীফা, যিনি ১২৮৮-১৩২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠ ছিলেন। উসমানী খিলাফত ১২৮৮-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৭ জন খলীফা কতৃক ৬৩৬ বছর পরিচালিত হয়। সর্বশেষ খলীফা ছিলেন দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ (১৯২২-১৯২৪)। ১৯২৪ সালে তুর্কি জাতীয়তাবাদী মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক একটি আইন করে খিলাফাতব্যবস্থা উচ্ছেদ করেন। এরই সাথে উসমানী খিলাফতের অবসান ঘটে। এরপর তথাকথিত আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্ক তুর্কি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত করেন। তখন থেকে বিশ্ববাসী আর কোনো খিলাফতব্যবস্থার মুখ দেখেনি।

মূলত ইহুদী-খ্রিস্টানদের চক্রান্ত এবং মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই উসমানী খিলাফত ধ্বংস হয়। এই মুনাফিকদের মধ্যে মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের পাশাপাশি আব্দুল আজীজ ইবনে সাউদ এর নামও উচ্চারিত হয়ে থাকে। ব্রিটিশ ফিলিস্তীনের বিষয়ে আব্দুল আজীজ ইবনে সাউদের সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করেনি। পক্ষান্তরে ইহুদীদের সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করেছে, যার ফলে ইহুদীবাদী ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। ইতিপূর্বে উসমানীয় খলীফাগণ ফিলিস্তীনে ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তিব্র বিরোধিতা করে আসছিলেন। এ কারণেই আবরদেরকে তাদের বিদ্রোহী করে উসমানী খিলাফত পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং ইসলামী খিলাফতের মহাশক্তি ছিন্ন-বিচ্ছন্ন হয়ে আরব ভূখণ্ডে ছোট ছোট কতিপয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়। [অনুবাদক]

থেকে আরব ভূখণ্ড ও পবিত্র স্থানসমূহ দখল করার এবং স্বাধীন চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা হয়েছিল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ইসলামীবিশ্ব বিশেষ করে হিন্দুস্তানে 'খিলাফত আন্দোলন' নামে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এর ফলে পশ্চিমা জোট সতর্ক হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতি বিশেষ করে হিন্দুস্তানী মুসলমানদের মধ্যে শুধু পশ্চিমা শাসনের বিরুদ্ধেই নয় বরং পশ্চিমা সংস্কৃতি ও পশ্চিমা জীবনধারার বিরুদ্ধে নজিরবিহীন প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়। হিন্দুস্তান হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ., কিয়ামুদ্দীন মাওলানা আবদুল বারী ফারাঙ্গী মাহাল্লী রহ., শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহ., মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ., রঈসুল আহরার মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহর রহ., ইমামুল হিন্দ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রহ. প্রমুখ রূপে এমন নেতা, বক্তা, কলমকার ও মুজাহিদ পেয়েছে, যারা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের জীবনে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি এবং পশ্চিমা শাসন ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্রোহী মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। অপরদিকে পশ্চিমা জোট দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ করে ক্লান্ত-শ্রান্ত ছিল। আর নিজেদের অভ্যন্তরীন বিষয়ে এত বেশি মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, তাদের পক্ষে নতুন কোনো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা কিংবা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব ছিল না। এজন্য এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ তারা উপযুক্ত মনে করেনি। বরং মুসলমানদের মন-মস্তিষ্কে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি, পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার এবং মুসলিম দেশগুলো থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করাকে যথেষ্ট মনে করে।

তবে পশ্চিমা শক্তির বিশেষ করে ব্রিটেনের সবচেয়ে বেশি মারাত্মক ও অশুভ পদক্ষেপ হলো 'ইসরাইল' নামক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ফিলিস্তীনের অধিকাংশে ইহুদী বসতি ও ইহুদী শাসন প্রতিষ্ঠিত করা এবং মসজিদে আকসা তাদের দখলে দিয়ে দেয়া। এটা একটি বড়ই দুঃখজনক ঘটনা, যা শুধু আরববিশ্বের জন্যে নয় বরং গোটা ইসলামীবিশ্বের জন্যে লজ্জাকর ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা এবং ভবিষ্যতের চিন্তা ও আশঙ্কার কারণ। এর সম্পূর্ণ দায়ভার আরবলীগ ও পার্শ্ববর্তী আরব সরকারগুলোর উপর বর্তায়, যারা এ আশঙ্কা সম্পর্কে, পশ্চিমাবিশ্বের উদ্দেশ্য এবং ইসরাইল ও ইহুদীবাদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতি অর্জন করেনি। এ অশুভ

ঘটনার ভয়াবহ পরিণাম এবং ভবিষ্যত আশঙ্কার তীব্রতা আঁচ করতে পারেনি।[১]

উক্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার এবং ইসরাইল ভীতি থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আবারও একজন বীর মুমিন, সুপুরুষ মুজাহিদ এবং নিঃস্বার্থ নেতার প্রয়োজন। যিনি দ্বীনের জন্যে বীর-বাহাদুর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পদাংক অনুসরণ করে তাঁর মতো উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন করবেন। এ কাজ আরব জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক ভেল্কিবাজদের দ্বারা সম্ভব নয়। একজন আরব ইতিহাসবিদ ও কবি খাইরুদ্দীন যারকালী মুসলিম উম্মাহ ও ফিলিস্তীনকে সম্বোধন করে কয়েক যুগ পূর্বে যে কথা বলেছিলেন তা আজও সঠিক বলে মনে হচ্ছে:

هاتى صلاح الدين ثانيةً فينا
وجدّدى حطّين أو شبه حطّينا

হে মুসলিম উম্মাহ! হে ফিলিস্তীন! আবারও সালাহুদ্দীন
আইয়ুবীর মতো যোদ্ধা মাঠে নামাও;
এবং হিত্তীনের যুদ্ধ[২] কিংবা হিত্তীনের মতো কোনো
শক্তিশালী যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করো।

চতুর্থ : আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মনে হচ্ছে, ক্রুসেডার খ্রিস্টান এবং ইহুদীবাদে বিশ্বাসী ইহুদীরা পূর্ববর্তী যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে যুদ্ধকৌশল (Strategy) পরিবর্তন করেছে। তারা আরব ভূখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলোর উপর সরাসরি আক্রমণ ও সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বিজয় লাভের পরিবর্তে এই পলিসি গ্রহণ করেছে যে, তারা তাদের বৃহত্তর স্বার্থ

---

১. ইহুদীবাদের বিশ্বব্যাপী গোপন মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অধ্যয়ন করুন: 'بروتوكولات حكماء صهيون' (আরবী), یہودیت عالمیہ - বিশ্বব্যাপী ইহুদীবাদ (উর্দূ) এবং The Protocols of the Learned Elders of Zion (ইংরেজী)।

২. হিত্তীন নামক স্থানে ফিলিস্তীনের চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়, যা 'হিত্তীনের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এতে ক্রুসেডাররা পরাজিত হয় এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী বাইতুল মুকাদ্দাসে বিজেতা রূপে প্রবেশ করেন।

আরব জাতীয়তাবাদী বিশেষ করে 'আরব বাথ পার্টি'র নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে উদ্ধার করবেন। তাদের জন্যে জাতীয় বীর (National Hero) হওয়ার, আরব ও অন্যান্য মুসলমানদের বিশেষ করে ফিলিস্তীনীদের ভবিষ্যতের আশার আলো এবং ভালোবাসার পাত্র হওয়ার সুযোগ করে দিবেন, যাতে তারা এসব অসাধু নেতাদের মাধ্যমে আরবদের মন-মস্তিষ্কে কুরুচি সৃষ্টি করে জাহেলী যুগে ফিরিয়ে নিতে এবং দ্বীনের প্রতি আরবদের আকীদা ও আমল দুর্বল করতে পারে। আর সম্ভব হলে তাদেরকে ইসলাম পূর্ববর্তী আরব জাহেলিয়াতের অবস্থানে ফিরিয়ে আনা হবে।[১] পশ্চিমা চিন্তাবিদ এবং ইহুদী-খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ যুগ যুগ ধরে এ স্বপ্ন দেখে আসছেন। এটা একটি মারাত্মক, গোপন ও গভীর ষড়যন্ত্র, যা বোঝার ও উপলব্ধি করার জন্য আরববিশ্ব ও ইসলামীবিশ্বের মেধা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন হলো দ্বীনী ও ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি এবং ইতিহাসের অধিক ও গভীর অধ্যয়নের। চলমান স্পর্শকাতর সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বীনী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এবং মুসলিম চিন্তাবিদ ও মিডিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী কলমকারদের বিশেষ করে যুবকদের এ সাহস ও তাওফীক দান করেন, যাতে তারা পশ্চিমাবিশ্বের ইসলাম বিরোধী চিন্তাবিদ ও ইসরাইলী বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্র বুঝতে সক্ষম হন। তা থেকে সুরক্ষা পেতে পারেন এবং এ আয়াতটি পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেন।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ○

"যে ভূমি উৎকৃষ্ট তার ফসল প্রতিপালকের নির্দেশে উৎকৃষ্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং নিকৃষ্ট ভূমি থেকে নিকৃষ্টই উৎপন্ন হয়ে থাকে।"[২]

সমাপ্ত

---

১. এ আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়। বরং যেমন কুয়েতে ঘটেছে তেমনিভাবে হিজাযের (মক্কা-মদীনা ও তায়েফের) পবিত্র স্থানসমূহেও সাদ্দাম হোসেনের প্রতিমা (Statue) লাগানো হতে পারে। যদি আবু জাহেল ও আবু লাহাবের নামে সম্ভব না হয় তাহলে হাতেম তায়ী ও আনতারা আবাসীর নামে বিভিন্ন একাডেমী (Academy) প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনকি ইরাক ও কুয়েতের মতো মদের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে। পবিত্র স্থানসমূহ, মসজিদ ও ইসলামী নিদর্শনসমূহের অবমাননা করা হবে। ইরাক ও কুয়েতে এরূপ বহু নমুনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

২. সূরা আ'রাফ, ৭: ৫৮